# আফ্রিকান সাফারি

অনুবাদ ঃ মনোরঞ্জন ঘোষ



গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : কুমার অজিত

দাম : আঠারো টাকা

# সূচীপত্র



* সত্যিকারের অরণ্য-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। কোন বানানো গল্প নয়। এ গ্রন্থের লেখকরা তাদের জীবদ্দশাতেই প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হন। দুটি ছাড়া সব কাহিনীই ভয়ঙ্কর সুন্দর আফ্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

**আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য অরণ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী**

**মাইকেল মিলনার**

হাতারি ১৬·০০

**ওসা জনসন**

আফ্রিকার জঙ্গলে ১২·০০

**অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত**

টার্জন সমগ্র ২০·০০

এক. অসুস্থ চিতা শিশুর সেবা করছেন অরণ্য প্রেমী যুগল

দুই. খেলাধুলার পরে তিনজনে এক সঙ্গে বিশ্রামরত। হস্তি শিশু, গণ্ডার শিশু এবং মানব শিশু।

তিন. জয় অ্যাডামসন চিতা শিশুর সঙ্গ উপভোগ করছেন।

চার. আফ্রিকার গভীর বনে জিরাফের আকৃতি পর্যবেক্ষণ করছেন এক অরণ্য অভিযাত্রী।

নিয়ে যায়। কোন ক্লান্ত হরিণ দৌড়ানোর গতি একটু শ্লথ করলেই পিছনের পায়ে এদের কামড় খায়। রক্তক্ষরণে মুমূর্ষু হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে ভক্ষণ করে এদের আশ মেটে না। লোভীর দল হরিণপালের পিছু ধাওয়া ত্যাগ করে না যতক্ষণ না দলের সমস্ত হরিণ তাদের কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। সেইজন্যে র‍্যাঞ্চের মালিক ও রিজার্ভ-ফরেস্ট-এর লোকেরা এদের ভয় করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

আমি গোয়াই অঞ্চলে এই ভয়ংকর কুকুরের দলকে দূর থেকে দেখেছি একটির পিছনে আর একটি এইভাবে সারি বেঁধে যেতে। যদি এদের দলেরই কোন কুকুর কখনো আহত হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে ছিঁড়ে খেতে এরা দ্বিধা করে না। স্টমবোক, ডুইকার, বাচ্চা কুডু, বানর, জেব্রা সবই এদের প্রিয় ভোজ্য বস্তু। উল্লিখিত প্রাণীগুলির মধ্যে শুধু জেব্রা ছাড়া আর সকলেরই অস্তিত্ব এরা গোয়াইয়ে বিলোপ করে দিয়েছে। জেব্রাদের সপরিবারে এখনও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। গর্দভ শ্রেণীর মধ্যে জেব্রাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। কোন কোন জেব্রা গোষ্ঠীর বর্ণসংকর শাসকেরা গর্দভ পিতার গাত্রবর্ণ পায় আর মাতার কাছ থেকে পায় চতুষ্পদে উজ্জ্বল ডোরা-কাটা দাগ। বন্য কুকুরদের আক্রমণ এড়িয়ে জেব্রাদের বেঁচে থাকার কারণ হচ্ছে তাদের তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ও অতি দ্রুত ধাবন-সক্ষম পদ-চতুষ্টয়।

এই বন্য কুকুরটিকে এক উই-ঢিবির কাছে সদ্যোজাত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ভ্যান তার মায়ের চোখ এড়িয়ে গোপনে তুলে নিয়ে আসেন। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর শিকারী কুকুরদলের নেতা হিসেবে এটিকে বড় করে তুলে খামারে লেপার্ডের উৎপাত বন্ধ করবেন, যার আগমনে তাঁর কুকুরেরা ভয়ে পালিয়ে আসে। বন্য কুকুরটি তাঁর অন্য কুকুরদের নিয়ে লেপার্ডের সঙ্গে লড়ে যাবে।

ল্যাভেণ্ডার যতদিন ছোট ছিল, তত দিন কোন সমস্যা হয়নি।

কিন্তু সে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কুকুরগুলি তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষা ছেড়ে দিল। কাছে এলেই গোঁ গোঁ করত। কুকুরদের ভয় দেখানো ছাড়াও ল্যাভেণ্ডার হানা দেওয়া শুরু করল ভ্যানের পোষা হাঁস-মুরগি-টার্কির ওপর। সে তারের বেড়ার ধারে ওৎপেতে বসে থাকত সুস্বাদু মাংসের লোভে। ওই নিরীহ প্রাণীদের দেখতে পেলেই সে চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তারপর শুধু তাদের মাংস নয় বড় হাড়গুলিও স্বচ্ছন্দে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেত।

ফার্মের পালিত পশুদের প্রাণহানি জনিত ক্ষতি সম্বন্ধে ভ্যানের মতামত জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা ভ্যান, আপনার সবচেয়ে ক্ষতিকারক জানোয়ারটি কে?'

বিনা দ্বিধায় ভ্যান উত্তর দেন, 'লেপার্ড। জানো ভায়া, লেপার্ডের মত কেউ কোন সময়েই নয়।'

তারপর ভ্যান তাঁর লেপার্ড-শিকারের কাহিনী শোনান। একটি বড় লেপার্ডের বর্ণনা করেন যে বছরের পর বছব ভ্যানের বাছুর মেরে শেষে ভ্যানের হাতে মরে। আর একটি কথাও বলেন, সেটিকে তিনি কিছুতেই মারতে পারেন নি।

'বার-এ রাখা বড় লেপার্ডের ছালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলেন, 'ওই ব্যাটা ভীষণ চালাক ছিল। বুঝলে ভায়া। লেপার্ডদের মধ্যে যদি কেউ শিক্ষিত বুদ্ধিমান হয়, তবে ওই ব্যাটাই হচ্ছে সে।'

ভ্যানের উক্তির অর্থ হচ্ছে যে, লেপার্ডটা একটার পর একটা বাছুর মারছিল আর ভ্যান তাকে মারতে পারছিলেন না। 'মড়ি'তে বিষ মাখিয়ে দেওয়ার সাধারণ যে উপায় আছে সেটি এর বেলায় একবারেই কাজের হয়নি। যদি মৃত পশুর ঘাড়ে বিষ মাখানো হয়, তাহলে সে এসে পায়ের দিকটা খাবে; আবার নিম্নাঙ্গে বিষ মাখালে সে ঠিক উর্ধাঙ্গ আহার করবে।

ফাঁদ পেতে ধরার প্রচেষ্টাকে সে যেন ব্যঙ্গভরেই ব্যর্থ করে দিত।

অকুস্থলে ভোরে তার পদচিহ্ন দেখে বুঝতে পারা যেত যে ফাঁদের চারধারে সে সতর্কভাবে ঘুরে বেড়িয়েছিল। শেষে টোপ হিসাবে রাখা মৃতদেহের ফাঁদের বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশটা ধরে সন্তর্পণে টান মেরেছিল, যাতে ফাঁদটা অকেজো হয়ে যায়। তারপর পেটপুরে আহার সেরে সরে পড়েছে।

ভ্যান যদি চারপাশে কাঁটা বিছিয়ে ফাঁদের নির্দিষ্ট দিকে যাওয়ার একটি সরু পথ তৈরি করে রাখেন, তাহলে সে ওই পথে পা না বাড়িয়ে কাঁটাগুলি লাফিয়ে এড়িয়ে যাবে।

মাসের পর মাস এই হানাদারটা নিয়মিতভাবে পালিত পশুদের হত্যা করে চলে।

ভ্যান বলেন, 'শেষে সেই লেপার্ডটা নিজেকে একটু বেশি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভাবল।'

তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপযুক্ত জটিল কোন কিছু না করে ভ্যান খুব সরল পদ্ধতির 'বন্দুক-ফাঁদ' পাতলেন। তাতেই সে কাৎ হলো। শিকারীরা সাধারণতঃ যেভাবে ফাঁদ পাতে বা বিষ দেয়, সে সবই লেপার্ডটা জেনে গিয়েছিল। কিন্তু এবার কোন 'স্প্রিং-ট্রাপ' নয়, কাঁটা-বিছানো পথ নয়; শুধু একটি বন্দুক, কিছু মাংস আর খানিকটা সরু তার। ভ্যানের সৌভাগ্য আর তার দুর্ভাগ্য যে ওতেই তার কাল হলো। এই বিশেষ প্রাণীটির পক্ষে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কুফল প্রদান করেছিল। সহজ সরল পদ্ধতিতে অবজ্ঞা করে জটিল কিছু আশা করে সে ভুল করেছিল।

ভ্যানের বর্ণিত অন্য লেপার্ডটি এখনও গোয়াইয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং র‍্যাঞ্চ মালিকদের ক্ষতি করে চলেছে। ভ্রমণকারীরা তাদের গাড়ির হেড-লাইটে তাকে ব্রিজের কাছে মাঝে মাঝে দেখতে পায়। আবার কেউ কেউ ঝর্ণার দিকে যাবার নির্জন পথে সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখেছে।

এই সাহসী বড় লেপার্ডটা ভ্যানের কম-বয়সী গরুকে মেরে

ভ্যানের ব্যবসার পক্ষে বেশ বড় আর্থিক ক্ষতি ঘটিয়েছিল। ভ্যান খুনেটার চৌদ্দপুরুষকে শাপান্ত করে তাঁর প্রিয় গরুর ভুক্তবিশিষ্ট অংশে স্ট্রিকনিন্ বিষ মাখালেন। তিনি পরে বুঝতে পারেন যে রাগের চোটে বিষের মাত্রা বেশ বেশিই দিয়ে ফেলেছিলেন। কারণ লেপার্ডটা ফিরে এসে প্রাণভরে সেই মাংস খাওয়ার পরেই বোমি করে ফেলেছিল। যা কিছু খেয়েছিল, তা সবই সে অসুস্থ হয়ে উগ্‌রে ফেলল এবং তার ফলে সে প্রাণে বেঁচে গেল!

ভ্যান বুঝলেন এই ব্যাপারটা থেকে লেপার্ডটা শিক্ষা-গ্রহণ করল। সে জীবনে আর কখনও ফেলে রাখা মৃত প্রাণীর কাছে ঘেঁষবে না। তারপর থেকে সত্যিই সে আরও বুদ্ধিমান ও হিংস্র হয়ে উঠল। কোন প্রাণী বধ করার পর তার মাংস যতটা পারে তক্ষুনি খেয়ে নিত, তারপর নতুন শিকারের সন্ধানে অন্য জায়গায় হানা দিত।

এই লেপার্ডের পায়ে একটু খুঁৎ ছিল। সেইজন্য তার পদচিহ্ন সহজেই অন্যদের থেকে পৃথক করা চলত। শেষে সারা গোয়াইয়ে তার পদচিহ্ন প্রসিদ্ধ হয়ে উঠল।

নিস্তব্ধ রাত্রে গোয়াইয়ের ঘন অরণ্যের অন্ধকারে শ্বাপদদের শত শত চক্ষু যখন রহস্যময় তারকার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তখন ভ্যানের পান্থশালায় বসে সেই সব প্রাণীদের সম্বন্ধে কত কাহিনীই না শোনা যেত। সে কাহিনী শুধু বৃহৎ বন্য প্রাণীদেরই নয়, ছোটরাও অপাংক্তেয় ছিল না। ভ্যান গল্প শোনাতেন গোপনে বিচরণকারী (গায়ে ছোট ছোট আঁশওয়ালা) পিপীলিকাভুকের, বড় 'আফ্রিকান ফেন-র‍্যাট-এর'—যাকে স্থানীয় বাসিন্দারা ধরে আগুনে ঝলসে খেতে ভালবাসে। ক্ষেতে হামলাকারী সজারুদের গল্পও বলতেন। এক রাতে তাঁর দুটি শিকারী কুকুর সজারুকে তাড়া করে শেষে সারা গায়ে কাঁটা বিঁধে ক্ষেপে যাবার সামিল হয়।

'বুশ-পিগ' নামে এক জাতের শুয়োর এ অঞ্চলে দেখা যায়। এক

রাতের মধ্যেই তারা একটা গোটা সব্জির বাগান ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্ধকার রাতে ভ্যান ক্ষেতের মধ্যে বসে এই শুয়োরের পালের আক্রমণের প্রতীক্ষা করতেন এবং শুনতেন দূরের সিংহগর্জন, নদী পারে লেপার্ডের হুংকার আর কাছাকাছি হায়নার তীক্ষ্ণ হাসি। এক রোমাঞ্চকর রহস্যে ভরে উঠত রাতের অন্ধকার। বন্য বরাহদলের হানা শুরু হলে তিনি গুলিবর্ষণ করতেন। তারা প্রাণ-ভয়ে তীব্র চিৎকার করে পলায়ন করলে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। আহত বুনো শুয়োর যে কী ভয়ংকর তা কারও অজানা নয়। ধারালো দাঁতে নিমেষের মধ্যে সে মানুষকে ফ্যালা-ফ্যালা করে চিরে ফেলতে পারে।

হাতি-সিংহ-হরিণ বাইসন প্রভৃতি অরণ্যের অধিবাসীদের মতো ভ্যানও ছিলেন অরণ্যেরই মানুষ। তাঁর প্রতিবেশী কোন প্রাণীকেই তিনি অবজ্ঞা করতেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলতেন যে কোন জন্তুকেই অবজ্ঞা করতে নেই। একটা আহত ক্ষ্যাপা মহিষও মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। অরণ্যের বেশির ভাগ প্রাণীই মানুষের কাছে করাল কৃতান্ত।

আফ্রিকার অরণ্যের প্রকৃতি যদি কেউ সঠিক জেনে থাকে তো সে হচ্ছে এই ভ্যান। ভ্যানের জীবন সঙ্গিনীও—যিনি 'মিসেস ভ্যান' এই সংক্ষিপ্ত নামে সকলের কাছে পরিচিত—সাহসের দিক দিয়ে স্বামীর থেকে কিছু কম যান না। বন কেটে বসত বানানো এবং অরণ্যাঞ্চলে র‍্যাঞ্চ ও হোটেল চালানো যে কত বিপদপূর্ণ তা তাঁরও অজানা ছিল না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যত জেলে, যারা বর্ষার পরে ওই নদীতে মাছ ধরতে আসত তারা সকলেই মিসেস ভ্যানের রান্নার স্বাদ জানে। ওই জেলেরা এখানে আসত দৈত্যাকার ভুণ্ডু বা বারবেল মাছ ধরতে, যাদের ওজন ষাট-সত্তর পাউণ্ড।

ভ্যান-দম্পতি আর নেই। হোটেলের নতুন মালিক তাঁদের

স্মৃতি অক্ষয় করে রাখতে ওই হোটেলের নাম পরিবর্তন করেনি। বর্তমানের বহু পরিবর্তনের মধ্যেও আজও 'ভ্যান নিয়েকরেক'স হোটেল বর্তমান আছে। এই পথে জলপ্রপাত বা রিজার্ভ ফরেস্টে যাওয়ার সময় আজও অনেকের ভ্যানের কথা মনে পড়বে। এই অঞ্চলের প্রাণীদের রোমাঞ্চকর শিকার-কাহিনীর বর্ণনাকারীর কণ্ঠস্বর নীরব হয়ে গেলেও এই অঞ্চলে তার স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়তো কোনদিন হবে না। কারণ এই মানুষটির জীবন ছিল অনন্যসাধারণ, অদ্বিতীয়।
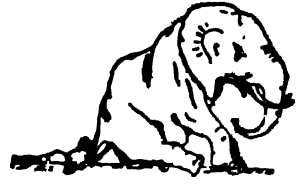
# আমার চারপাশে নরখাদক
## (Man-eaters were all around me)

[ নিষ্ঠুর ওঝারা নিজেদের নির্মম স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয় দেখিয়ে মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেছিল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র গ্রামবাসীরা তাদের সব দাবী মেনে নিত, পাছে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও সিংহ কর্তৃক ভক্ষিত হতে হয়। গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্যে লেখককে যথেষ্ট ধৈর্য এবং তার চেয়ে বেশি সাহস দেখাতে হয়েছিল। ]

বহুকাল আগে আমি টাঙ্গানাইকার উসোরীতে ছিলাম। এখন সেখানে হয়তো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সে সময় জায়গাটার খুবই বদনাম ছিল।

অত্যাচারী নির্দয় ওঝারাই যত গণ্ডগোলের মূলে ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে এক সংঘ গড়েছিল এবং তাদের মধ্যে একজন সেই সংঘের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করত।

সেই নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী ওঝারা অজ্ঞ জনসাধারণের কুসংস্কারজাত ভীতির সুযোগ গ্রহণ করত। তাদের হৃদয়ে এক বদ্ধমূল বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, ওঝারা ইচ্ছে করলে সিংহের রূপ ধারণ করতে পারে।

অন্য জায়গায় ওঝারা লোকদের অভিশাপের ভয় দেখায়। তার বদলে এখানে ওঝারা ভয় দেখিয়ে বলত যে, তাদের দাবী না মানলে সিংহের পেটে যেতে হবে।

ওঝাদের অসন্তুষ্ট করার ভয়ে গরীব গ্রামবাসীরা সর্বদা ভীত হয়ে থাকত। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে, নর-সিংহের হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। অর্ধ মানুষ বলে নৃ-সিংহের পক্ষে মানুষের আচরণ, গমনাগমন ইত্যাদি সহজেই জানা সম্ভব। পশুর চেয়ে বেশি বুদ্ধি তার মাথায়। ওই ভয়ংকর প্রাণীর কবল থেকে কি আত্মরক্ষা করা যায়?

ত্রিশ দশকের এক সময় আমি উসোরী জেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে ক্যাম্প করে এক রাত্রি থাকার সময় আমি ওই নরখাদকরা যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, তা জানতে পারলাম। এই শত্রুর বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের আদিম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়তে সাহস পেত না। লড়াইয়ের আগেই তারা নিজেদের পরাজিত বলে মনে করত। যদি তারা বুঝত তাদের শত্রু শুধু মানুষ বা শুধু পশু, তাহলে তারা হার-জিৎ-এর কথা না ভেবেই লড়াই করত। কিন্তু মানুষ ও পশুর এক ভয়ংকর সংমিশ্রণ তাদের ভয়ে দিশাহারা করে দিয়েছিল।

আমি শুনলাম যে হানাদার সিংহেরা আশপাশের 'কারালে' (আফ্রিকার বেড়া দিয়ে ঘেরা গ্রাম) মানুষ হত্যা করে চলেছে। বিশেষ করে কালো কেশরওয়ালা এক বিরাট পশুরাজের নেতৃত্বে একটি দল সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে চলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ওই পশুরাজটি হচ্ছে ওঝাদের দলের কর্তা। তার কবল থেকে গ্রামবাসীদের কেউ যে রক্ষা করতে পারে এ আশা তাদের নেই। এই দুর্জয় শত্রুর বিরুদ্ধে 'সাদা চামড়ার' মানুষের কোন কৌশলই কাজে লাগবে না,—এটাও তাদের বিশ্বাস।

এই জেলায় নরখাদক সিংহ আগেও ছিল। কিন্তু এখন এখানে ওরা যতগুলি এসে জুটেছে, ততগুলি কোন কালেই ছিল না। কালো

কেশরধারীর নেতৃত্বে ছ-সাতটি সিংহের ওই দলটিকে প্রতিটি গ্রামের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় করে। এছাড়া তিন-চারটি সিংহের এক দলের কথাও গ্রামবাসীরা বলে। অতএব অন্ততঃ এক ডজন সিংহ আপাততঃ এই জেলায় উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে এই সিংহদের কিছু নিঃসন্দেহে ওঝারা হলেও বাকি কিছু হচ্ছে প্রকৃত সিংহ। যা হোক, তারা আমায় অনুরোধ করল বিপদে তাদের সাহায্য করার জন্য কিছুকাল তাদের ওখানে বাস করতে এবং তারাও সাধ্যমত আমায় সাহায্য করার সংকল্প জানাল। স্বভাবতই আমি তাদের প্রস্তাবে সম্মত হলাম। জীবনে এতগুলি নরখাদকের মোকাবিলা করা'র সুযোগ আসায় আমার মনে বেশ এক শিহরণ জাগল।

মার্জার জাতীয় এই প্রাণীদের একটি সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে যে এরা একজন অন্যজনের শিকারস্থলে একই সময়ে হানা দেয় না। যখন একটি দল কোন এক 'কারালে' হানা দেয়, তখন অন্য হানাদাররা কাছাকাছি থাকলেও সেই সময় ওখানে হানা না দিয়ে অন্যত্র চলে যাবে।

আমার সঙ্গে আমার মাস-ভৃত্য, রাঁধুনী, বন্দুকবাহক ছাড়াও একদল মালপত্র বাহক ছিল। আমি বুঝলাম গ্রামবাসীদের পক্ষে তাদের সকলকে ঠাঁই দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে তারা আমার সঙ্গে তাঁবুতে থাকলেই বেশি নিরাপদে থাকবে বলে আমি মনে করি।

আগুনের ভয়ে সিংহ কাছে ঘেসে না বলে যে প্রচলিত ধারনা আছে সেটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। কাঁটার বেড়া সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। আমার অভিজ্ঞতায় জ নি,—নরখাদকদের দেশে আমার অভিজ্ঞতাও কিন্তু কম নয়—সিংহকে দূরে রাখার পক্ষে কার্যকর হচ্ছে 'প্রেসার-ফেড স্টর্ম ল্যান্টার্ন'-এর আলো। এই ধরনের সবচেয়ে

সাধারণ লণ্ঠন হচ্ছে তিনশো ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের। খুব বেশি লোক না হলে ওই ধরনের একটি আলোতেই কাজ চলে যায়। লণ্ঠনটি একটা বাক্স বা কিছুর উপর রেখে তার চারদিকে ক্যাম্পের লোকদের শোবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। লণ্ঠনের আলোকে এক উজ্জ্বল আগুন বলে মনে হবে। যদি রাত্রে একবার উঠে কেরোসিনের লেভেল নেমে গেলে পাম্প করার অভ্যাস করে নেওয়া যায়, তাহলে ক্যাম্প একেবারে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

যখনই আমার সঙ্গে মালবাহী কুলি বেশী থাকে—যেমন এবার ছিল—তখনই আমি ঘুমন্ত মানুষগুলির কাছে বেশ কয়েকটি এই ল্যাণ্টার্ন টাঙিয়ে রেখে দিই। এই চোখ ঝলসান উজ্জ্বল আলোর সীমানার মধ্যে দুর্দান্ত সাহসী হানাদারকেও আমি কখনও এগিয়ে আসতে দেখিনি। আমার লোকেরাও এ কথা জানত এবং তারা বেশ নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে তাঁবুতে বাস করত।

সেদিন রাতেব মত যেই আমরা তাঁবু খাটিয়েছি, আমি প্রায় শ' দেড়েক গজ দূরে হঠাৎ কিছু নরনারীর ভয়ার্ত চীৎকার শুনতে পেলাম।

জলাশয়ের দিকে যাবার রাস্তা থেকে চিৎকারটা শোনা গেল। এখানকার লোকের নরখাদকদের আক্রমণের ভয়ে সব সময় দল বেঁধে আসা-যাওয়া করে।

চিৎকার থেকে বুঝলাম যে নিশ্চয়ই মেয়েরা দল বেঁধে জল আনতে যাচ্ছিল এবং তাদের সঙ্গে বর্শা ও কুড়াল নিয়ে কিছু পুরুষও ছিল। যা হোক, এই মানুষগুলি হচ্ছে চাষা, শিকারী নয়। তাদের বর্শাগুলিও মাসাইদের মত নয়, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

এই অঞ্চলটা ঝোপ জঙ্গলে ভরা। চার ফুট লম্বা ঘাস এখানে প্রচুর জন্মায়, যার মধ্যে সিংহ সহজেই আত্মগোপন করতে পারে।

দলটির কাছে যাবার জন্যে আমার বন্দুকবাহক ও আমি তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়লাম। লোকগুলির সঙ্গে দেখা হতে তারা বলল

যে কয়েকটা সিংহ ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে তাদের কাছাকাছি এসেছিল, কিন্তু তারা দলবদ্ধ থাকায় এবং তাদের মধ্যে 'দল-ছুট' করাতে না পারায় বোঝা যাচ্ছে যে সিংহদের আক্রমণ করার ইচ্ছা জাগেনি। তারা সঠিকভাবে বলতে পারে না ঠিক কটি সিংহ হানা দিতে এসেছিল। তবে তাদের বেশির ভাগের কথায় বুঝলাম যে তিনটি বা চারটি সিংহ এসেছিল।

সিংহগুলিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, সেখানকার ঘাসবনের মধ্যে আমি ঢুকলাম। বেশ কয়েকটি জন্তু এখানে ঘোরাফেরা করেছে তার চিহ্ন দেখতে পেলাম। তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা সম্ভব না হলেও চারপাশের দলিত-মথিত ঘাস থেকে বেশ কয়েকটির উপস্থিতি অনুমান করা গেল। দুর্ভাগ্যক্রমে বড় বড় ঘাসের জন্যে আমি সিংহদের দর্শন করতে সক্ষম হলাম না। যত বনের মধ্যে অগ্রসর হতে লাগলাম ততই ঘাসগুলি আকারে দীর্ঘ হতে থাকে। শেষে বাধ্য হলাম তাদের অনুসন্ধানে বিরত হতে।

সেই রাত্রেই মাইল খানেক দূরের এক 'কারালে' আমরা ড্রামের শব্দ শুনতে পেলাম। বন্দুকবাহককে নিয়ে আবার আমি বেরিয়ে পড়লাম।

'কারাল'টার কাছাকাছি এগুতে লোকজনের হল্লা শুনে আমরা বুঝতে পারি যে আক্রমণ বেশ ভয়াবহ আকারের হয়েছে।

আমরা যত দ্রুতগতিতে পারা যায় অগ্রসর হই। অকুস্থলে যখন প্রায় পৌঁছেছি, ঠিক তখন হঠাৎ আমার সামনের ঘাসবন থেকে এক সিংহ বেরিয়ে এল। আমার মনে হয় সে আক্রমণের জন্য তার দলের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছিল। আমার উপস্থিতি সে টের পায় না, কারণ বন থেকে সে পথের যে জায়গায় বের হলো, সেটি আমার কয়েক ফুট সামনে। তার মাথা আমার দিক থেকে ঘোরান ছিল আর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল দূরে যে জায়গায় গোলমাল হচ্ছিল সেই দিকে।

আমি আমার 'শুটিং-ল্যাম্পে'র সুইচ টিপলাম। আমি দেখলাম

সেটি বেশ বড় এক সিংহিণী। তীব্র উজ্জ্বল আলোক রশ্মি গায়ে পড়ায় সেও ঘুরে আমায় দেখল। মনে হলো বেচারা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় অবাক হয়ে ভাবে চাঁদটা এত কাছে কী করে চলে এসে এমন আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে !

আমি তাকে গুলি করলাম। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে আমি তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে আর সময় নষ্ট না করে কারালের দিকে ছুটে চলি। আশা করি সময়মত সেখানে পৌঁছতে পারলে আরও কয়েকটাকে মারতে পারব। কিন্তু আমার বন্দুকের শব্দ নিশ্চয়ই তাদের ভয় পাইয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিল। কারণ আমার গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথেই দূরের সব গোলমাল থেমে যায়।

সেখানে পৌঁছে সত্যিই আর আমি কোন সিংহ দেখতে পেলাম না। বলাবাহুল্য যে আমার আলোর রশ্মি চারধারে ফেলেও কোন ফল পাইনি।

আমার ভেবে একটু অবাক লাগল যে জন্তুগুলি এত ভীতু হলো কেমন করে ? আমার অভিজ্ঞতায় বলে নরখাদক সিংহরা একটু অন্য ধরনের। অবশ্য আফ্রিকার অন্য অঞ্চলের চেয়ে এই অঞ্চলে প্রাণীরা শিকারীদের বন্দুকের সঙ্গে একটু বেশি পরিচিত। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা আমায় বলেছিল যে বেশ কিছুকাল হলো কোন শিকারী এ অঞ্চলে শিকার করতে আসেনি।

যা হোক, আমি আশা করি এ অঞ্চলের অন্য সিংহগুলি এই হানাদারদের মত ভীতু হবে না। সব সময় পালিয়ে বেড়ালে আমার পক্ষে তাদের শিকার করা খুবই কষ্টকর হবে। তাছাড়া সময়ও অনেক ব্যয় হবে এই জেলাকে সিংহের উপদ্রব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে। সেক্ষেত্রে আমি কিছু মুস্কিলে পড়ব, যেহেতু আমার এখানে পড়ে থাকার কোন আইন সঙ্গত কারণ নেই এবং টাঙ্গানাইকায় শিকার করার লাইসেন্স আমার নেই। আমার শুধু এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাবার কথা ছিল। পাঠকদের হয়তো মনে হতে পারে

যে আমার লাইসেন্স থাক বা না থাক নরখাদক পশু বধ করলে কোন সরকারী কর্মচারীর আপত্তি করার কী আছে? কিন্তু ব্যাপারটা প্রায়ই অন্য রকম ঘটে। আইনকানুন রক্ষাকর্তারা সব সময় আইন-কানুনের দিকটাই দেখেন।

হানাদারদের দলের মাত্র একটিকে বরাতক্রমে বধ করলেও আমার হতাশ হবার কিছু নেই। রাত সবে শুরু হয়েছে। যারা ভয়ে পালিয়েছে তাদের কিন্তু ক্ষিদে মেটেনি। কাজেই রাত শেষ হবাব আগেই তারা কাছাকাছি কোথাও আর একবার হানা দেওয়ার চেষ্টা করবে।

মনে মনে যে সম্ভাবনার কথা ভাবি, সেটি খুব শীঘ্রই সত্য হয়ে উঠল। মৃত সিংহিণীর পাশ দিয়ে আমি ও আমার বন্দুকবাহী ক্যাম্পে সবে মাত্র ফিরে এসেছি এমন সময় সেই দলটি বা অন্য কোন দল কাছাকাছি আর এক গ্রামে হানা দিল।

একটু অন্যদিকের এক 'কারাল' হতে ড্রামের শব্দ শুনে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। মাইল খানেকের একটু বেশি আমাদের যেতে হবে। সেখানে পৌঁছোবার আগেই হতভাগ্যদের ভয়ার্ত আর্তনাদ ও তীব্র চেঁচামেচি কানে এল।

আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছোলাম, তখন সেখানে সিংহের মেলা বসেছে বলে মনে হলো। চারদিক থেকেই 'সিংহ-সিংহ' চিৎকার কানে আসে।

আমাদের সামনের এক কুটীরের চালে এক সিংহ দেখতে পেলাম। সে চালের খড় সরিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। আমি তাকে গুলি করলাম। সে ভয়ংকর গর্জন করে চালের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। নিজের লক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস থাকার ফলে ওটার দিকে আমি তখন আর নজর দিই না। ওর আরও একটা বুলেটের প্রয়োজন থাকলেও ওর পিছনে সময় দেবার মত সুযোগ আমি পাইনি।

গুলির শব্দ শুনে আমার ঠিক ডানদিকের এক কুটীর থেকে আরও দুটো সিংহ বেরিয়ে এল। আমার থেকে তাদের দূরত্ব মাত্র ন-দশ পা। দুটোকে গুলি করতে আমার কোন অসুবিধা হলো না। পরে আমি জেনেছিলাম যে ওই শয়তান দুটো কুটীরের বাঁশের ঝাঁপ ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে চারজন কুটীরবাসীকেই হত্যা করেছিল—এক পাকাচুলো বুড়ি আর তিনটি ছোট শিশুর প্রাণ গিয়েছিল।

কিন্তু এই সব নয়। কারালের দূর প্রান্তের এক কুটীর থেকে এমন করুণ এক আর্তনাদ ভেসে আসে যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো ওখানেও কোন এক মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটছে। অন্য সব জায়গায় আমার প্রথম গুলিবর্ষণের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ ও গোলমাল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওখানকার আর্তনাদ আর একটু দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বন্ধ হবার আগে এক অস্বস্তিকর গোঙানির মধ্যে শেষ হয়েছিল।

আমি সেদিকে ছুটলাম আমার টর্চের আলো প্রতিটি দরজা ও চালের ওপর ফেলতে ফেলতে। শেষে যা ভয় করছিলাম তা দেখতে পেলাম—ভাঙা দরজা আর খড়ের চালে ফোকর।

স্বভাবতই আমি অনুমান করলাম যে নরহন্তা এতক্ষণে সরে পড়েছে। যদি কিছু এখন আর করার থাকে তাই দেখার জন্যে আমি খোলা দরজার দিকে সোজা এগিয়ে গেলাম।

শিকারী হিসাবে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার ফলে কুটীরে ঢোকার জন্যে নিচু হওয়ার সময়েও আমি আমার রাইফেল প্রস্তুত করে রাখি হঠাৎ প্রয়োজন হলে ব্যবহার করার জন্যে। ভাগ্যিস তাই করেছিলাম। নিচু হয়ে ভাঙা বাঁশের দরজা দিয়ে কুটীরের ভেতর ভাল করে দেখলাম। দরজাটা আধভাঙা হয়ে একপাশে আটকে ছিল। কুটীরের ভেতর ঢোকার আগেই আমি এক বিরাট সিংহিণীর মুখোমুখি হলাম—দুজনের মাঝখানে শুধু ওই ভাঙা দরজা। ঘরের যেটুকু আমার নজরে পড়ল তাতে দেখলাম যে ওই সিংহিণীর ঠিক পিছনে তার জুড়ি এবং ওই দুটির থেকে একটু দূরে গুঁড়ি মেরে

রয়েছে এক আশ্চর্যজনক কালো কেশরধারী সিংহ। ওদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের যেটি, সেটি আমার থেকে মাত্র পাঁচ-ফুট দূরে।

কুটীরের ভেতরটা যেন একবারে কসাইখানা। পাঁচটি মেয়ের দেহ চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সিংহরা সেগুলি খাওয়ায় ব্যস্ত ছিল। মাটির শক্ত মেঝে রক্তের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে!

সেই মুহূর্তে অবশ্য কুটীরের সবকিছু আমার বিশদভাবে চোখে পড়েনি। চকিত দৃষ্টিতে আমি শুধু দেখতে পেয়েছিলাম যে নরখাদকরা মানুষ মেরেছে আর তাজা রক্তে ঘর ভাসছে।

তৎক্ষণাৎ আমায় সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল আমায় কী করতে হবে। আমরা যদি কোন খোলা জায়গায় থাকতাম তাহলে এটা খুবই সোজা ব্যাপার ছিল। কুটীরের মধ্যে যদি একটি সিংহ থাকত, তাহলেও বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু এইরকম অবস্থায় একসঙ্গে তিন-তিনটি নরখাদকের মুখোমুখি আমি জীবনে হইনি।

আমি দু নলা বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্যে না হয় দুটিকে নিমেষে বধ করলাম। কিন্তু তৃতীয়টিকে নিয়ে কী করব? আমার জানা ছিল যে বস্তু জানোয়াররা পরিষ্কার দেখতে পায় না, সেই বস্তুকে তারা সচরাচর আক্রমণ করে না। আমার টর্চের আলো নিশ্চয় ওদের চোখে ধাঁধা লাগবে। যাহোক, তৃতীয় জন্তুটি বুঝতে পারবে সে কুটীরের মধ্যে শত্রুর খপ্পরে পড়েছে। তাই সে পালাবার চেষ্টা করবে এটা হয়তো আশা করা যেতে পারে।

আমার মনে জাগল খড়ের চালের বড় ফোকরটার কথা। সিংহদের মধ্যে একটা অন্তত: ওই পথে প্রবেশ করেছে। তাহলে আমি আশা করতে পারি যে গুলিবর্ষণ শুরু করলে আগন্তুকদের একজন তার পরিচিত পথেই পালাবার প্রচেষ্টা করবে। দরজা দিয়ে আমার গা ঘেসে সে যাবার ইচ্ছা করবে না। দরজার কাছে জায়গাও খুব কম, সেখান দিয়ে কোন বড় সিংহকে পালাতে হলে আমাকে

ধাক্কা দিয়ে যেতে হবে। এক নরখাদকের গায়ে ধাক্কা খাবার ইচ্ছাটা আমি করি না।

সেই দারুণ মুহূর্তে মাথায় যে চিন্তাগুলি এসেছিল তা বর্ণনা করতে কত সময় লাগছে! অথচ ওই চিন্তাগুলিই মনের মধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে খেলে গিয়েছিল বোধহয় এক মুহূর্তের শতাংশের মধ্যে।

আমি ভেতরে মাথা গলানোর সঙ্গে সঙ্গে যে সিংহিণীটি সবচেয়ে কাছে ছিল, সেটি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার সঙ্গী দুটি মুখ না তুলে মৃতদেহগুলি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সিংহিণীটিকে আমি প্রথম গুলিতেই বধ করলাম। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

গুলি করার সময় আড় চোখে আমি দেখি বন্দুকের শব্দ শুনেই কালো কেশরধারী চালের ফোকর লক্ষ্য করে লাফ মারল। ওর সম্পর্কে আমার আর কিছু করার রইল না।

দ্বিতীয় সিংহিণী লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি আমার দিকে থাকায় সে বোধহয় টের পেল না যে ধেড়ে সিংহটা বেগতিক বুঝে তাকে ফেলে সরে পড়েছে।

তাকে বধ করতে আমার কোন অসুবিধা হলো না। কারণ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একবার উজ্জ্বল আলোর দিকে আর একবার ভূপতিত সঙ্গিনীর দিকে দেখছিল। সে বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিল না কী ব্যাপার ঘটছে এবং তার সঙ্গিনী ওই রকম নিথর হয়ে কেন শুয়ে আছে।

দলের কর্তা কালো কেশরওয়ালা বড় সিংহটা পালিয়ে যেতে আমার খুব দুঃখ হয়, আর সেই দুঃখ আরও বেড়ে যায় ঘরের মধ্যে ওই পাঁচটি নিহত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে। মেয়েদের মধ্যে বড়টির বয়স ষোল-সতেরো হবে। এই রকমভাবে বীভৎস মৃত্যুও সেই বয়বালিকাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে খর্ব করতে পারেনি। তাদের

দিকে চাইলে মমতায় আর হত্যাকারীর প্রতি ক্রোধে হৃদয় ভরে ওঠে। এক রাত্রে পাঁচটি নরখাদককে বধ করায় গ্রামবাসীদের যে পরিমাণ আনন্দ হওয়া উচিত ছিল, তা চাপা পড়ে গেল তাদের এতগুলি আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে।

গ্রামবাসীদের শোক-দুঃখের সঙ্গে ভয়ও সমানভাবে বেড়ে গেল। কারণ তাদের মনে ওই ধারণা আরও দৃঢ় হলো যে কালো কেশরধারী সিংহটা রোজাদের সর্দার ছাড়া আর কেউ নয়। না তাহলে সে কী করে পালাতে পারে? একই কুটীরের মধ্যে রাইফেলের সামনে তার দুই সঙ্গিণী মারা গেল, অন্যত্র তার তিন সঙ্গী মরল, আর তার দেহে কিনা একটি আঁচড়ও লাগল না! নৃ-সিংহ না হলে এটা সম্ভব নয়।

তাদের এ কথা বোঝাবার সব চেষ্টাই বৃথা হলো যে কেশরধারীটা ওঝা নয়, সিংহই। সে তার এই নরহত্যার খেলা চালিয়ে গেলে একদিন না একদিন তাকে আমার গুলিতে মরতেই হবে। ওদের ধারণা এই অলৌকিক সব ক্রিয়া-কাণ্ড সম্বন্ধে 'সাদা মানুষের' কোন জ্ঞানই নেই। অজ্ঞ ব্যক্তির কথার কী দাম আছে?

আমার অজ্ঞতা নিয়ে আমার সামনে হাসাহাসি করার মতো অসভ্য বা দুর্বিনীত তারা নয়। কিন্তু আমি আফ্রিকাবাসীদের ভাল করে চিনি। প্রয়োজন হলে ভাবলেশহীন মুখোস দিয়ে তারা যেন মুখমণ্ডলকে ঢেকে নেয়, তখন মরা মাছের মত চোখে মনের কোন ভাব ফুটে ওঠে না। মনোভাব গোপন রাখতে তারা রীতিমত ওস্তাদ।

যত দিন কাটে, ততই ঘটনাচক্র নৃ-সিংহ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলে। জেলার বিভিন্ন স্থানে সে নরহত্যা করে বেড়ায়। আমিও ইতিমধ্যে এখানে-ওখানে কয়েকটা সিংহ মারলাম। কিন্তু সেই কালো কেশরওয়ালা সিংহের দর্শন কোথাও পাই না।

আমার ক্যাম্প ওই জায়গা থেকে মাইল চারেক দূরে সরিয়ে নেওয়ার পর আমি এক রাতেই তিনটি সিংহ শিকার করলাম। ওই

ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামে আমি ছুটি সিংহ শিকার করার পরে সেটিকে বিপদমুক্ত বলেই মনে হয়েছিল। তাই আমি কোথাও আস্তানা গাড়লে ক্যাম্পের আলো লোকজন দেখে সিংহেরা যেমন আমাদের এড়িয়ে চলত, আমিও তেমনি গোঁ ভরে তাদের খুঁজে চলতাম। কিন্তু আমার খোঁজাখুঁজি বিফল করে কালো কেশরী দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াত।

কালো কেশরী যে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে এই খবরের সত্যতা প্রমাণিত হতো পদচিহ্নের দ্বারা। আমাকে প্রায়ই হানাদারদের পদচিহ্ন খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে হতো এবং বেশ কয়েকবার আমি তার পদচিহ্ন দেখতে পাই।

অবশ্য এটাও ঠিক যে তার আক্রমণের কথা অনেক সময় বেশ বাড়িয়ে বলা হতো। যার মূলে হচ্ছে তার সম্বন্ধে কিংবদন্তী আর ভয়। কারণ অনেক সময় পদচিহ্ন দেখে বিশেষ কিছু অনুমান করা যেত না, শুধু বোঝা যেত সেগুলি সিংহের পদচিহ্ন এবং সেটা যে কোন সিংহেরই হওয়া সম্ভব।

একবার তো এক জায়গায় কালো কেশরওয়ালা সিংহের হানার খবর পেয়ে আমি গিয়ে বেশ বড় একটি সিংহকে শিকার করতে সক্ষম হলাম। স্থানীয় আধবাসীরা তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে হানাদার সিংহের কথা তারা বলেছে সেটাকেই আমি মেরেছি। তাদের বিশ্বাস আমার দ্বারা নিহত সিংহটি হচ্ছে 'প্রকৃত সিংহ' তাদের সেই 'নর-সিংহ' নয়। অথচ সেখানে যে পদচিহ্নগুলি আমি দেখেছিলাম, সেগুলি 'নর-সিংহে'র বলে দৃঢ়ভাবে সনাক্ত করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। আমার ধারণা পদচিহ্নগুলি ওই হানাদারটিরই আর তাদের ধারনা পদচিহ্ন অভ্রান্ত নয় এবং আসল হানাদার হচ্ছে নরসিংহ। যাহোক, ওই সিংহটিকে মারার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা জানাল এবং এটাও জানাল যে কালো কেশরধারীকে আমি কোনদিনই মারতে পারব না, কারণ সে তো সাধারণ সিংহ নয়, ওঝাদের সর্দার।

তারা আমাকে তাদের অভিমত স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিল। তাদের জন্য আমার এই প্রচেষ্টাকে তারা খুবই প্রশংসা করে। কিন্তু আমি বৃথাই আমার সময় নষ্ট করছি। এতগুলি 'প্রকৃত' সিংহ তাদের এই জেলায় আর কোন শিকারী কোনকালে শিকার করেনি। কিন্তু ওঝা সর্দারের রোষ তথা কালো কেশরওয়ালা নরসিংহের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করা আমার ক্ষমতার বাইরে। এটা তাদেরই দুর্ভাগ্য বা অভিশাপ। আমার সমস্ত সদ্‌ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাদের দুর্ভাগ্য দূর করতে পারব না।

লোকগুলির জন্য করুণা জাগার সাথে এক জেদও আমার মনে জাগল। কালো শয়তানটা আমাকে যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, তাকে না মারা পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না। আমি আজ পর্যন্ত যত নরখাদকের মোকাবিলা করেছি, তার মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে সাংঘাতিক, সবচেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে ধূর্ত। আগে যখন সে সদলে হানা দিত তখন কখনও দিনের বেলায় আক্রমণ করত না, সশস্ত্র ব্যক্তিরা তার দলবলকে দেখতে পেয়ে যাবে বলে। এখন সে একা হওয়ায় অতর্কিতে এসে দিনের বেলাতেও হানা দেয়।

জেলার সমস্ত গ্রামবাসীরা ক্রমশঃ এমন ভীত ও হতাশ হয়ে পড়ে যে তারা এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। অবশ্য এ কথাও তারা ভাবে যে পালিয়ে গেলেও ওঝা-সর্দারের হাত থেকে পরিত্রাণ তারা পাবে না। যেখানেই তারা যাক না কেন সিংহরূপ-ধারণ সক্ষম সর্দার তাদের অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হবে।

সত্যিই বেচারারা দুর্ভাগা! গ্রামের লোকদের জলের জন্য বসবাস-সীমানার বাইরে যেতে হবে। জলাশয়ে যাবার পথের ধারে ঘাসবন এখনও পুড়িয়ে ফেলার মতো শুকনো হয়নি, ঋতু অনুযায়ী তৃণভূমি সতেজ রয়েছে। তাই দীর্ঘ ঘাসের আড়ালে আত্মগোপন করে নরহন্তা কখন কোথায় হানা দেবে তা সঠিক কেউই বলতে পারে না।

জানোয়ারটা মনে হয় জেনে গেছে যে জেলার প্রতিটি কারাল হতে লোকেরা দল বেঁধে কোন না কোন সময়ে জল আনতে যাবে। তাই সে ধৈর্য ধরে কোন ঝোপে গা ঢাকা দিয়ে থাকলে তার কাছ দিয়ে ওই লোকেরা জলাশয়ে যাবে।

নরহন্তা যে কৌশল অবলম্বন করল তা হচ্ছে দলের সকলের পিছনের মানুষটির উপর হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া। অন্যেরা কিছু বোঝার আগেই সে শিকার নিয়ে ঘাসবনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার পিছনে ছুটে যাওয়ার মত যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত না থাকায় দলের অন্যেরা ঘাসবনের মধ্যে ঢোকার সাহস পেত না।

এই গরীব নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রতি তার তাচ্ছিল্যের ভাব ভাল করে প্রকাশ করার জন্য কখনও কখনও নৃশংস নরহন্তা দলের যে কোন এক অংশে হানা দিয়ে নারী পুরুষ যাকে হোক তুলে নিয়ে যেত। ঘন কেশর ও ঘাসের মধ্যে সরু পথ ধরে চলতে হতো বলে লোকগুলি অনেক সময় বাধ্য হতো একজনের পিছনে অন্যজন সারিবদ্ধ ভাবে হাঁটতে। জোট বাঁধা অবস্থায় হাঁটার সুযোগ তারা কমই পেত।

জানোয়ারটাকে ধরার জন্যে জানা সব কৌশলই আমি অবলম্বন করলাম। কিন্তু মনে হলো সে যেন জাদু জানে। অবশ্য তার ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে হানা দেবার সুযোগ তার পুরোপুরিই ছিল। আর সব নরখাদকের মতোই এরও এক শিকারস্থান থেকে অন্য শিকারস্থানের দূরত্ব বেশ বেশিই থাকত।

তাছাড়া সে এক জায়গায় হানা দেবার পরে আবার কোথায় যে হানা দেবে, তা অনুমান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কারণ তার কার্যকলাপ কোন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে ছিল না। আর আমি একথাও বুঝলাম যে নিজেকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে তার জন্য ফাঁদ পাতলেও কোন লাভ হবে না। এর আগে আমি অনেকবার বিভিন্নস্থানে ওই পদ্ধতিতে সাফল্য লাভ করেছি। কিন্তু এই নরহন্তাটি

রাত্রে আক্রমণ করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। সে বুঝেছে দিনের বেলা আক্রমণ করা অনেক সহজসাধ্য ও সাফল্যজনক।

স্থানীয় বাসিন্দারা যদিও প্রথমে আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল এবং তাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি চেয়েছিল, কিন্তু আমি বুঝি যে তারা এখন আর আমায় সাহায্য করতে তেমন আগ্রহী নয়। বরং তারা এখন চায় যে আমি এই জেলা থেকে চলে যাই, কারণ তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জমেছে যে আমি নরসিংহকে বধ করার চেষ্টা করছি বলে ওঝা সর্দার তাদের শাস্তি দিয়ে চলেছে। এ-ছাড়াও তাদের ভয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে বেশি দিন থাকলে ওই নর-সিংহ আমাকে মেরে খেয়ে ফেলবে। তার ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেটা ভেবেও তারা ভীত।

এইসব কারণে নরহন্তাটি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পাওয়া আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ বরাতক্রমে আমি যে খবরটা চাইছিলাম তা পেয়ে গেলাম। এর জন্য আমি দুটি ছেলের কাছে ঋণী, যারা আমার ক্যাম্পে বেশির ভাগ সময় কাটাত। তারা হচ্ছে দুটি আফ্রিকান নিগ্রো যুবক। এই ধরনের যুবকদের পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা যায়। তাদের জাত বা গায়ের রং যাই হোক না কেন, তারা হচ্ছে তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক—উজ্জ্বল চোখমুখ, সদা প্রফুল্ল, বুদ্ধিমান, সব বিষয়েই উৎসাহী, দেখা মাত্রই যাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা যায়।

ছেলে দুটি পরস্পরকে খুবই ভালবাসত, সর্বদা একসঙ্গে থাকত। ওদের দেখা মাত্রই আমার ভাল লেগেছিল এবং সেটা বোধ হয় তারা বুঝতে পেরেছিল। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত আমার কাছ থেকে আমায় লক্ষ্য করত এবং আমি উৎসাহ দিলে নিঃসংকোচে আমার সঙ্গে গল্প করত।

অবশ্য এটাও তাদের অজানা ছিল না যে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আমায় যতটা সাহায্য করা উচিত, তা করা হচ্ছে না এবং তাদের আপন-জনেরা চায় যে আমি এই জেলা ছেড়ে চলে যাই।

যা হোক, আমার তরুণ বন্ধুরা একদিন আমায় জানাল যে তারা মধুর সন্ধানে জঙ্গলের মধ্যে যাচ্ছে। একটি 'মধু-পাখি' (honey bird) এসে কাছাকাছি ঘুরছে। তাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তারা পাখিটার সঙ্গে গিয়ে দেখবে কিসের জন্য এই আহ্বান।

আফ্রিকার জঙ্গলে এই মধু-পাখি হচ্ছে এক অদ্ভুত জীব। এ মানুষের আবাসস্থলের কাছে এসে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে সমানে ডাকতে থাকবে। আফ্রিকানরা এর চাল চলনের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত। এই ছোট পাখিটির ডাকে তারা কোন কর্ণপাত না করে নিজেদের কাজ করে চলে। কিন্তু পাখিটি তাতে নিরুৎসাহিত হয় না। খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে আবার ডাকাডাকি ও কাছাকাছি গাছে ঘোরাঘুরি শুরু করে দেয়।

ওর ডাক শুনে কেউ ওকে অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে পাখিটিকে শিস্ দিয়ে জানিয়ে দেয় সে ওর সঙ্গে যেতে প্রস্তুত। পাখিটি তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং নিকটবর্তী আর একটি গাছে গিয়ে বসে। ডাকাডাকি আর ডানা ঝাপটানি সমানভাবে চালিয়ে যায়। এইভাবে এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে সে অনুসরণকারীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। শেষ পর্যন্ত যে গাছে মৌচাক আছে, সেখানে নিয়ে যায়। যে গাছে মৌচাক আছে সেই গাছের এক ডাল থেকে অন্য ডালে বসে সে অবিশ্রাম ডানা ঝাপ্‌টিয়ে ডেকে চলে, যতক্ষণ না তার অনুসরণকারী সেখানে তার কাজ শুরু করবে।

কাজ শুরু হলে সে কাছের আর একটি গাছে বসে নীরবে সবকিছু লক্ষ্য করতে থাকে। তখন আর তার একটি ডাকও শোনা যাবে না।

যদি অনুসরণকারী কোন বিশেষ মৌচাকের কাছে যাওয়া অসম্ভব

বলে মনে করে, তাহলে সে শিস্ দিয়ে পাখিটিকে তা জানিয়ে দেয়। তখন পাখিটি তার জানা অন্য কোন মৌচাকের দিকে ওড়া শুরু করবে বিন্দুমাত্র হতাশ না হয়ে। মৌচাকের মধু অবশ্য পাখিটির কাম্য নয়, সে চায় মৌচাকের ছোট কীটগুলি। তাই অনুসরণকারীও প্রথানুযায়ী সেগুলি তার জন্য ফেলে রেখে যায়।

আমার তরুণ বন্ধু দুটিকে মধু-পাখি আহ্বান জানিয়েছে এবং তাদের মনেও তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছা জেগেছে। তাই তারা ওর পিছু পিছু যাত্রা শুরু করল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক সময় কাটার আগেই তারা দৌড়োতে দৌড়োতে ফিরে এল। উত্তেজনায় তাদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে তারা বলল—বাওয়ানা! বাওয়ানা! কালো কেশরওয়ালা সিংহ! ওখানে সে কিছু খাচ্ছে। আমরা যখন গাছে উঠে মৌচাকের খোঁজে এদিক-ওদিক দেখি, তখন তাকে দেখতে পাই। যদি আপনি শিগ্‌গীর আসেন, তাহলে ওকে গুলি করতে পারবেন, বাওয়ানা!'

আমি রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে তাদের পথ দেখাতে বললাম।

তারা আমাকে সেই গাছটির কাছে নিয়ে গেল, সেটি মধু-পাখি তাদের দেখিয়েছে। পাখিটি বোধহয় খুবই হতাশ হয়ে গিয়েছিল, যখন দেখল যে তার অনুসরণকারীরা এখানে এসেই ফিরে চলে গেল। সেই মৌচাক বা অন্য কোন মৌচাকে তারা আগ্রহ না দেখাতে পাখিটি তাদের উপর আস্থা রাখতে পারে না। তাই তার কোন চিহ্ন আর সেখানে দেখা গেল না।

যুবকদের একজন গাছে উঠে পড়ল। বিশেষ একটি দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করল। তারপর নিচে আমাদের দিকে চেয়ে এক গাল হেসে ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে সিংহটি এখনও ওখানে আছে।

গাছ থেকে নেমে সে আমাদের কাছে এল। ফিস্‌ফিস্ করে

বলল, 'এখনও ওখানেই আছে, বাওয়ানা। চলুন! আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ছোট ছোট ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে আমরা নিঃশব্দে প্রায় পঁচাত্তর গজ এগোলাম। তারপর আমার তরুণ গইডটি দাঁড়িয়ে পড়ল। এক ছোট ঝোপের পাশ দিয়ে সাবধানে উঁকি মারল।

সে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল। তারপর খুব আস্তে আস্তে প্রকৃত জংলি মানুষদের মত পিছিয়ে এসে আমাকে ইঙ্গিতে বলল এগিয়ে এসে তার স্থান গ্রহণ করতে। আমার বাহু ধরে সন্তর্পণে টেনে সে আমায় ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল এবং চিবুকটা সামান্য তুলে জানিয়ে দিল কোন জায়গাটা লক্ষ্য করতে হবে।

পঁচিশ পা দূরেও নয়, সেই আশ্চর্য কালো কেশরী তার প্রসাধন কার্যে ব্যস্ত রয়েছে। নিজের সামনের পা চাটছে, পা দিয়ে মুখ ও গোঁফ ঘসে পরিষ্কার করছে। (আহারকার্য বোধহয় খুব সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি, মুখময় খাদ্যবস্তুর রক্ত-মাংস লেগে গেছে।)

পশুরাজের কানে রাইফেলের গর্জন পৌঁছাবার আগেই দেহে গুলিটা পৌঁছে গেল। মরার আগে সে সম্ভবতঃ জেনে যেতে পারল না কিসে তার মৃত্যু হলো। তাকে বধ কবার ব্যাপারটা এই রকম হাঙ্গামাহীন হলো।

জানোয়ারটা এক বৃদ্ধের মৃতদেহ ভক্ষণ করছিল। বৃদ্ধ একা কেন জঙ্গলে এসেছিল? কখন তাকে সিংহটি ধরেছিল,—এ কথা ওই বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউই বলতে পারবে না। কারণ কেউই জানত না যে সে সিংহের কবলে পড়েছে। কিন্তু বৃদ্ধ আর কোনদিন সে-কথা জানাতে পারবে না। এখন তার দেহের অল্পই অবশিষ্ট আছে।

মৃত সিংহের পায়ের ছাপ ভাল করে পরীক্ষা করায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে এটিই সেই কিংবদন্তীর নৃ-সিংহ, এই অঞ্চলের 'কারাল'গুলির সন্ত্রাস।

আমার যুবক সঙ্গীদ্বয় খুবই উৎফুল্ল হলো। তাদের স্বাভাবিক যে সংকোচ থাকার কথা তা অদৃশ্য হয়ে গেল। তারা আমার হাত জড়িয়ে ধরে, পিঠ চাপড়ায়। এই ভয়ংকর নরখাদককে বধ করার ব্যাপারে তাদেরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ আছে সে-কথা একেবারেই ভুলে যায়। কথাটা আমিই তাদের মনে করিয়ে দিলাম এবং এ কথাও জানাই যে তাদের এই সাহায্যের কথা সারা জেলার লোক জানবে।

আমি তাদের আরও বলি যে আমাদের গাইড মধুপাখিটিকেও শিস্ দিয়ে ডাকা দরকার। এই ব্যাপারে তারও কিছু পুরস্কার প্রাপ্য। ওই ছোট প্রাণীটি আমাদের এখানে না নিয়ে এলে সিংহের সন্ধান পাওয়া যেত না এবং এত কাছ থেকে এত সহজে তাকে শিকার করা যেত না।

আমার এই কথা যুবক দুটিকে খুবই খুশি করল। তারা শিস্ দিয়ে মধুপাখি‌কে ডাকাডাকি করে এবং মধুপাখিও এসে হাজির হয়। অবশ্য এ সেই মধুপাখিটি না অন্য কোন মধুপাখি তা আমরা সঠিক বলতে পারব না। তবে সেইটি বলেই আমরা ধরে নিলাম। আমার সুদীর্ঘকাল আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় আমি জানি যে বেশির ভাগ প্রাণী—পশু, পক্ষী বা মৎস, যাই হোক না কেন একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে শিকার করে বেড়ায় এবং তার সেই বিচরণভূমিতে তারই জাতের অন্য কেউ এলে তাকে তাড়িয়ে দেবে। একটির বেশি মধুপাখিকে একই মৌচাকে আমি কারুকে নিয়ে যেতে দেখিনি, কিংবা মৌচাক পাড়ার সময় গাইড মধুপাখিটি ছাড়া অন্য কোন মধুপাখিকে কখনও এসে জুটতে আমি দেখিনি।

একথা কি বলা দরকার যে স্থানীয় বাসিন্দারা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না মৃত সিংহটা সত্যিই সেই কালো কেশরী। কারণ নৃ-সিংহকে বধ করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

যা হোক, সেই পশুরাজকে মারার পর উসোরী জেলায় নরখাদকের হানা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। যদিও পদচিহ্ন হচ্ছে এক নির্ভুল প্রমাণ এবং তার দ্বারাই ওই নরহন্তার পরিচয় আমি তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। তবু স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করল যে ওঝা-সর্দারের মানুষ খাওয়ায় অরুচি হওয়ায় সে সাময়িক-ভাবে নরহত্যা বন্ধ করেছে এবং ওই মৃত সিংহটা হচ্ছে 'প্রকৃত' সিংহ, নর-সিংহ নয়

যা হোক, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটি বিষয়ই আমি বিশেষ করে মনে রাখতে চাই, সেটি হচ্ছে তরুণ আফ্রিকানদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের আমার এই অভ্যাসটি এবারও আমায় বিশেষভাবে উপকৃত করল।

# হাত বনাম থাবা

## (Hand and Claw)

[ বন্যপ্রাণীকে বন্দুক দিয়ে বধ করার চেয়ে ক্যামেরায় বন্দী করা অনেকের কাছে বেশি আনন্দদায়ক। কিন্তু অবস্থাবিপাকে এক আহত গুলবাঘের মুখোমুখি হয়ে র‍্যাট্‌ট্রের মনে রাইফেলের কথাই বেশি জেগেছিল। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে জানোয়ারটার এত কাছে সে ছিল যে রাইফেলে কোন কাজ হতো না। তাই তাদের সাক্ষাৎকার শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল—'হাত বনাম থাবা'। ]

সন্ত্রাসমূলক মাউ-মাউ আন্দোলনের আগে কেনিয়ায় বসবাস-কারীরা বলত সে দেশটি হচ্ছে 'ঈশ্বরের লীলাভূমি', স্বর্গস্বরূপ। সেখানে সারা বছরের সব ঋতুগুলিই সুন্দর। জগতের সব জায়গার চেয়ে সবকিছুই সেখানে ভাল জন্মায়। সেখানকার মত ট্রাউট-মৎস শিকার আর কোথাও করা যায় না, আর ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী যে-কোন ধরণের বড় বন্যপ্রাণী শিকার করা বা তার ছবি তোলা চলে। অবশ্য বাধাস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গণ্ডারের খুব কাছে গিয়ে তার একটা ভাল ছবি তুলতে হলে রীতিমত সন্তর্পণে এগুতে হবে। বড় শিংওয়ালা অ্যান্টিলোপ, অরিক্স বা ইম্পালা জাতের হরিণের নিকটবর্তী হওয়াও বেশ দুষ্কর।

এখানে আর এক ধরণের উত্তেজনাপূর্ণ কাজ হচ্ছে অ্যাবিসিনিয়ায় হানা দিয়ে সে দেশের লোকের গরু মোষ নিয়ে পালানো। সে

দেশের লোকেরাও বহু বছর ধরে এদেশে ওই কাজটি করে আসছে। ক্লাশ অ্যালেক ও অনেস্ট জন নামে দুজন দুঃসাহসী মানুষ এই কাজকে তাদের 'হবি' করে তুলেছিল। কারণ কাজটি বিপজ্জনক হলেও কম লাভজনক নয়।

যুদ্ধের পর সৈন্যবাহিনীর যারা অবসর নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তাদের যখন খুব সহজ শর্তে ওখানে জমি দেওয়ার কথা হলো, তখন আমি স্থানটি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠলাম। আমরা ছ'জন নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী টাকা পয়সা জোগাড় করলাম। আমাদের ছ'শো একর জমি দেওয়া হলো। প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে একর প্রতি এক পাউণ্ড বছরে দিতে হবে। যতখানি জমিকে চাষের যোগ্য করে তুলতে পারব, ততখানি জমির জন্যে কোন টাকা দিতে হবে না ; এটাও শর্তের মধ্যে ছিল। তার ফলে আমরা জমির পুরো খাজনাই ছাড় পেলাম, এক কথায় আমরা বিনা মূল্যে জমি পেয়ে গেলাম।

আমাদের মধ্যে বি. এফ. নামে একজনকে আমরা ম্যানেজার করলাম। বি. এফ. প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে চাষের কাজে নেমে পড়ল। সারা জমিতে সে কফি উৎপাদনে লেগে গেল। জমি খুবই উর্বর, নদীগর্ভের কাছে কিছু পাথর বা বোল্ডার ছাড়া সর্বত্রই মাটি ভাল।

কিন্তু পরে আমরা টের পেলাম যে আমাদের জমিটা পড়েছে শিলাবৃষ্টির অঞ্চলের মধ্যে এবং এখানে এমন দারুণ শিলাবৃষ্টি হতে থাকে যে কফির ঝোপগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। সেজন্য যেটুকু জমিতে কফি চাষ করেছিলাম তা বেচে দিয়ে বাকি জমিতে আমরা চা লাগালাম। শিলাবৃষ্টি কফি-গাছের মত চা-গাছের অতটা ক্ষতি করতে পারে না।

কেনিয়াতে আমরাই প্রথম চা-গাছ লাগাই এবং ব্রুকবণ্ড কোম্পানীর কাছে আমাদের চা বিক্রি করতাম। এখন তারা

নিজেরাই খুব বড় চা-বাগান ওখানে করেছে। যা হোক, সেটা অনেক পরের ঘটনা। প্রথম যুগে কফি যখন আমাদের প্রধান চাষের বস্তু ছিল, তখন আমি আমাদের স্টেট পরিদর্শনে যেতাম।

মাউ-মাউ সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে যে কিকুউরা উপজাতি পরবর্তীকালে সবচেয়ে সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল তারা আমাদের বিশেষ বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ছিল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবার কালে পথে দাঁড়িয়ে বা বসে জটলারত কিকুউনের ছোট দল খুশিভরা কণ্ঠে সম্বোধন করত—'জাম্বো বাওয়ানা' অর্থাৎ ভাল আছেন, কর্তা?

তাদের ও লুম্বা উপজাতির মধ্যে থেকেই আমাদের জমির বেশির ভাগ ক্ষেত মজুর পেতাম। আর মাসাই উপজাতি হচ্ছে লড়াকু জাত, তারা কোন রকম মজদুরি পছন্দ করত না। অথচ মাউ-মাউ গণ্ডগোলের সময় এই মাসাইরা আমাদের সাহায্য করেছিল।

আমি ভারতে থাকা কালে খুব অসুখে ভোগায় লম্বা ছুটি পেয়েছিলাম। কিন্তু সোজা দেশে যাওয়ার বদলে আমি প্রথমে কেনিয়া গেলাম আমাদের জমিটা দেখার জন্য। ভ্রমণটা খুব সুখের হয়নি। জাহাজটা ছোট ছিল, তাই ঢেউয়ের দোলানি বেশি হওয়ায় মোটেই আরাম পাইনি এবং মন-মেজাজ সকলের উপরই বিগড়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে মোম্বাসা ছিল একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দর এবং হোটেলে স্থান পাওয়া রীতিমত কষ্টকর ছিল।

একটিমাত্র রেললাইন ছিল নাইরোবি পর্যন্ত। তার মানে দেশের অর্ধেকের বেশি জায়গা দিয়ে গেছে ওই একটি লাইন। আমি মোম্বাসা পৌঁছে শুনলাম যে সেদিন সন্ধ্যের আগে আর কোন ট্রেন ছাড়বে না।

দিনটা বেশ গরম ছিল। মোম্বাসা প্রায় বিষুবরেখার উপর অবস্থিত। সেইজন্য সারা বছর সেখানে শুধু একটিই ঋতু এবং সেটি হচ্ছে খুব কষ্টদায়ক গ্রীষ্মকাল। ভারতে যেমন আমরা এক

শীতকালের প্রত্যাশা করতে পারি, এখানে সে আশা করা চলে না। ফলে আফ্রিকা সম্পর্কে আমার মনে এক বিরূপ ধারণা জন্মাল।

শহরে এক ঘর্মাক্ত দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় আমি ট্রেনে চাপি। ট্রেন সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ছ হাজার ফুট উপরে এক অধিত্যকায় অবস্থিত নাইরোবির উদ্দেশ্যে লম্বা চড়াইয়ের পথে যাত্রা শুরু করল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা উপকূল অঞ্চল থেকে দূরে সরে গেলাম। আবহাওয়া একটু ঠাণ্ডা হলো। গরমে খিদে মরে যাওয়ার জন্যে রাত্রে খুব কমই খেলাম। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতে দেখলাম যে সব বদলে গেছে। আবহাওয়া অনেক ঠাণ্ডা ও সুখকর। প্রাতরাশে ফ্রায়েড এগ ও বেকন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। জানলা দিয়ে দেখি আমরা ধীরে ধীরে খুব উপরে উঠছি। বাইরের দৃশ্য আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

লাইনের উত্তর ধারে খুব কাছেই সব রকমের জন্তুদের চরে বেড়াতে দেখি। নজরে পড়ল জিরাফ, জেব্রা, কোঙ্গনি, নানা জাতের ও নানা আকৃতির হরিণ - ছোট ডুকার থেকে অ্যান্টিলোপ পর্যন্ত।

তাদের কেউ কেউ ট্রেনের শব্দে চমকে উঠে খানিকটা দৌড়ে যায়, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে। কিন্তু বেশির ভাগ প্রাণীকেই দেখলাম ট্রেনের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করল না।

লাইনের দক্ষিণ দিকে কিন্তু একটি প্রাণীকেও চোখে পড়ল না। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা বুঝতে পারি না, কারণ লাইনের দু ধারের চারণভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তো প্রায় একই রকম।

পরে অবশ্য আমি জেনেছিলাম যে এর কারণটা খুবই সাধারণ। এই রেললাইনটি হচ্ছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অঞ্চল'-এর দক্ষিণ সীমান্তরেখা। ওই বিরাট অঞ্চলে বহু বছর ধরে শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওই অঞ্চলের বন্য প্রাণীরা তাই বুঝে গেছে যে রেললাইনের কোন দিকটা তাদের পক্ষে নিরাপদ।

কয়েক বছর পরে ভারতবর্ষেও আমি এই ব্যাপার দেখেছিলাম। বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত বনের এক বিরাট অংশকে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করার কাজের সঙ্গে সে সময় আমি জড়িত ছিলাম। সেখানে ছ' হাতের মধ্যে হরিণ বা বাইসনকে ক্যামেরার রেঞ্জের মধ্যে বিনা ক্লেশে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, অথচ আগে তাদের রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে পেতেই খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন হতো।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে আমার চোখে বহির্দৃশ্য সুন্দরতর হয়ে উঠতে থাকে। দুপুরের খাওয়ার সময় মাংস, আলুভাজা, পুডিং, আপেল-পাই, ক্রিম ইত্যাদি আমি এমন খেলাম যে পাঁচ বছর আগে ইংল্যাণ্ড ছাড়ার পর আর কোনদিন তেমন খাইনি।

সারা বিকাল কাটালাম জানলা দিয়ে প্রকৃতির ক্রোড়ে বিস্ময়কর বন্যজীবন দর্শন করে। রাতে পেট পুরে খেয়ে মড়ার মতো ঘুমোলাম।

পরদিন যখন নাইরোবি পৌঁছালাম, তখন আমি বুঝতে শুরু করেছি কেন এই স্থানকে বলা হয় 'ঈশ্বরের লীলাভূমি'।

স্টেশনে বি. এফ. আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমায় মোটরে করে নিয়ে চলো আমাদের 'বুরেট স্টেটে'। বুরেট কথাটার অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর-উদ্যান'। এই নন্দন-কানন ধরনের নামটার জন্যে বি. এফ. মনে মনে খুবই গর্ব বোধ করে। এই নিয়ে তার সঙ্গে যেই একটু পরিহাস করতে যাব—কারণ সুন্দর উদ্যানের গন্তব্যপথটি রীতিমত অসুন্দর, এব্ড়ো খেব্ড়ো পাথুরে রাস্তা—অমনি হঠাৎ সে প্রাণপণে ব্রেক কষল।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাওয়ার সঙ্গে দেখলাম আমাদের পুরানো গাড়ির পিছনের একটি চাকা গাড়িকে পরিত্যাগ করে আমাদের চোখের সামনে দিয়ে আপন খেয়ালে দৌড়ে চলেছে। গাড়িটা ঠ্যাং ভাঙা মানুষের মত কেৎরে পড়ে 'নট নড়ন-চড়ন' হয়ে গেল। আমি নেমে দৌড়ে গিয়ে চাকাটাকে পাকড়াও করে আনি। তারপর দুজনে মিলে সেটাকে তার স্বস্থানে বসিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম।

সপ্তাহখানেক বুরেটে কাটানোর পর আমরা নাইরোবিতে ফিরে এলাম। আমাদের পুরানো ফোর্ড গাড়িটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে আমাদের যাত্রাপথের শেষ ভাগটুকুতে গাড়িটাকে একপাল বলদ দিয়ে টানিয়ে নিতে হয়। মোটরগাড়ির এই গরুর গাড়িতে রূপান্তর হওয়ার ব্যাপারটি বেশ হাস্যকর হয়েছিল।

এখানে ব্রিয়ারলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারতে আমরা একই সৈন্যদলে থাকার সময় তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে হচ্ছে আমাদের এই যৌথ-উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। আমরা ফোর্ড গাড়িটাকে বাতিল করে সেটা বেচার টাকায় এক ঝকঝকে নতুন ল্যাণ্ডরোভার কিনলাম, যার বডিটা এই অঞ্চলে ভ্রমণের উপযুক্ত। আমরা স্থির করলাম কেনিয়া পর্বত অঞ্চলে এই গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করব। ভ্রমণ স্থান হিসাবে নির্বাচিত করলাম উয়াসী নেয়ারীর উত্তরের সমতলভূমি, অ্যাবিসিনিয়া সীমান্ত ও ওই নামের নদীটির মধ্যবর্তী বন্য-অঞ্চল।

ওই জায়গায় বন্যপ্রাণীর কোন অভাব নেই। তাই আমি আশা করলাম একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশে বহু বন্য জন্তুর চমৎকার ছবি তুলতে সক্ষম হবো। এই কাজটি বন্য জন্তু শিকারের চেয়ে অনেক শক্ত।

আমরা যখন যাত্রা করতে প্রস্তুত হলাম, তখন আমাদেব গাড়িটাকে যে কেউ দেখলে অবাক হয়ে যেত। তার মনে হতো দুনিয়ার যাবতীয় জিনিষ তাতে তোলা হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে খুব বেশি কিছু না হলেও আমরা গাড়িটা বোঝাই করেছিলাম কয়েকটি তাঁবু, তাঁবু খাটাবার সরঞ্জামাদি, কয়েকটা রাইফেল ও ক্যামেরা, রান্নার ও আহারের জিনিষপত্তর, টুকিটাকি অনেক কিছু সমেত আমরা তিনজন এবং গোঁদের উপর বিষফোড়ার মতো টগো, যে হচ্ছে বি. এফ.-এর পক্ষে অপরিহার্য ক্যাম্পে রান্নার লোক।

অত্যন্ত বিস্ময়কর এক বনভূমির মধ্যে দিয়ে আমরা যাত্রা করলাম। বহু গাছে গোছা গোছা ফুল ফুটেছে এবং বৃহদাকারের প্রজাপতিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্ষণকালের জন্য তাদের পছন্দ মতো কোন জায়গায় বসছে। দূর থেকে তাদের দেখে মনে হয় যেন উজ্জ্বল রত্নরাশি। নানা ধরনের বাঁদর মাথার উপরে ডালগুলিতে মহানন্দে দোল খাচ্ছে। তাদের মধ্যে আছে বড় লোমওয়ালা কালো ও সাদা সুন্দর কলোবাস, দুষ্টু বেবুন, নীল বাঁদর, যার ছাল মেয়েদের ফারকোটের জন্য মূল্যবান এবং যাদের সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।

আমরা বিপজ্জনক নদী ও দুরন্ত ঝর্ণা পার হই। সেখানে জল থাকলেও গাড়ি নিয়ে পার হওয়া যায়, সে সব জায়গায় আমরা একজস্ট পাইপে রবারের নল গুঁজে সেই নলটা গাড়ির চালে বেঁধে দিই, যাতে ইঞ্জিন না জল টানতে পারে।

দিন দুয়েকের মধ্যে আমরা শীতল উচ্চভূমি হতে নিচে নেমে আসি। নাইরোবি শহরটা ওই উচ্চভূমির উপরে। আমরা ক্রমশঃ প্রবেশ করলাম উয়াসী নেয়ারী নদীর তটভূমি ও অ্যাবিসিনিয়া রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত উষ্ণ অঞ্চলে।

আমাদের প্রথম রাত্রিটি খুবই অস্বস্তিকর অবস্থার ম ধ্য কাটে। কারণ ক্যাম্প করার জন্য কাছাকাছি জল আছে এমন কোন জায়গা দেখতে পাই না। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসার আগে আমাদের ওয়াটার-বটলগুলিতে যে জল ভরে নিয়েছিলাম, তাই দিয়েই আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়।

পরদিন আমরা কণ্টকাকীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করলাম। ব্রিয়ারলে একটা জেরেনুক শিকার করল। এটি হচ্ছে অ্যান্টিলোপ জাতীয় লম্বা ঘাড়ওয়ালা হরিণ। এদের ঘাড় এত লম্বা হয় যে ছোট জিরাফ বলে মনে হয়। এই শিকারের ফলে আমাদের বেশ কয়েকদিন মাংসের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আমি ও ব্রিয়ারলে জঙ্গলে ঢুকেছিলাম এক অরিক্সের পিছু নিয়ে ছবি তোলার জন্যে। অরিক্স হচ্ছে শক্তিশালী হরিণ। তার আঁকাবাঁকা শিং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং শিংয়ের ডগা ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ। শোনা যায় যে অরিক্সের শিংয়ের ঘায়ে সিংহ পর্যন্ত মারা যায়। অনেক সময় দেখা গেছে সিংহ ও অরিক্স পাশাপাশি মরে পড়ে আছে; অরিক্সের ঘাড় ভেঙেছে আর অরিক্স সিংহকে এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে। ওর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে সিংহের প্রাণান্ত হয়েছে।

হঠাৎ আমরা বি. এফ.-এর চিৎকার শুনে ছুটে যাই। ছুটে গিয়ে দেখি এক কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছের ডালে কোনরকমে ঝুলে সে হাত-পা ছুঁড়ছে আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

শুনলাম যে ব্রিয়ারলে যখন জেরেনুকাকে গুলি করে তখন বন্দুকের শব্দে ভয় পেয়ে এক সিংহিণী তার দুটি বাচ্চা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ে। তারা ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে বি. এফ. যেদিকে ছিল সেদিকেই আসতে থাকে। বি. এফ.-এর কাছে কোন রাইফেল ছিল না, সে দুটি আমাদের কাছে ছিল। সে তাই প্রাণ বাঁচতে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে কাছাকাছি যে বাবলা গাছ ছিল তাতেই উঠে পড়েছে এবং তারপর বাবলা-কাঁটার খোঁচায় অস্থির হয়ে আর্তনাদ করছে।

আমরা তাকে গাছ থেকে নামতে সাহায্য করে বোঝাই যে এক্ষেত্রে গাড়িতে থাকলেই সে ভাল করত। সিংহ ওই কিম্ভূত-কিমাকার গাড়ি নামক বস্তুটির কাছে ঘেঁষত না, কিন্তু খোলামেলা জায়গায় মানুষ নামক জীবটিকে দেখতে পেলে ছেড়ে দিত না।

আমরা সমতল ভূমির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালাই। আশাকরি অন্ধকার নেমে আসার আগেই নদীর কাছে পৌঁছোতে পারব। সেখানে র‍্যাট্‌ট্রের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আছে। কিন্তু বেশি দূর যাওয়ার আগেই আমরা দেখলাম দিগন্ত রেখার দিক থেকে সে এগিয়ে আসছে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে।

জেমস র‍্যাট্‌ট্রে হচ্ছেন কেনিয়ায় প্রথমে যেসব সাহেব-শিকারীরা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতদের অন্যতম। এখন তিনি গ্রেভি জেব্রা ধরার ও পোষ মানানোর কাজে জড়িয়ে আছেন।

গ্রেভিরা হচ্ছে সুন্দর বড় জানোয়ার; গ্রান্ট জাতীয় প্রাণীর চেয়ে চালাক ও শক্তিশালী এবং সহজে পোষ মানে। তখনকার দিনে পূর্ব আফ্রিকার মধ্যে দিয়ে মালপত্তর নিয়ে যেতে হলে বলদে টানা ওয়াগন ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এই বলদের দল নিয়ে যখন বহু মাইল বিস্তৃত মক্ষিকাদের অঞ্চলে আসা হতো তখনই যাত্রীদের ভীষণ মুস্কিলে পড়তে হতো। কারণ মারাত্মক ভসি মাছিদের কবল থেকে বলদদের বাঁচানো যেত না। কুলিদের মাথায় মালপত্তর চাপিয়ে ভ্রমণ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

সেই যুগে র‍্যাট্‌ট্রে এক আশ্চর্য উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এই মাছির আক্রমণে জেব্রারা মরে না। তাই তিনি গ্রেভি-জেব্রা ধরে তাদের দিয়ে গাড়ি টানার ব্যবস্থা করলেন।

তিনি ষোলটি জেব্রাকে পোষ মানিয়ে যখন এই কাজে নিযুক্ত করেছেন, তখন তাঁকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়তে হয়। দুর্ভাগ্য এক লেপার্ডের রূপ ধরে এসেছিল।

সেই সময় তাঁর সঙ্গে ক্যাম্পে ছিলেন মার্টিন জনসন। মার্টিন আফ্রিকার বন্য জন্তুদের নিয়ে ফিল্ম তুলছিলেন। এই ধরণের সব ফিল্মনির্মাতাদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন পথিকৃৎ।

একদিন সন্ধ্যায় র‍্যাট্‌ট্রে তাঁব খচ্চরের পিঠে চেপে শিকারে বেরিয়েছিলেন আহারের জন্য কিছু মাংসের ব্যবস্থা করতে। শিকার শেষে তিনি যখন ক্যাম্পে ফিরছিলেন তখন এক লেপার্ড হঠাৎ দেখতে পেলেন। তিনি তাকে গুলি করলেন। গুলি খেয়ে জানোয়ারটা লম্বা ঘাসের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল।

র‍্যাট্‌ট্রে তাঁর বাহন থেকে নেমে জানোয়ারটার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল সেটি মারা গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

সে মরেনি। মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও সে র‍্যাট্‌ট্রেকে আক্রমণ করল। র‍্যাট্‌ট্রে তার এত কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন যে রাইফেল ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন না। তিনি দু হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরে দমবন্ধ করে মারার চেষ্টা করেন। দুজনে জড়াজড়ি করে মাটিতে পড়ে যায়।

অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ বলে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে প্রায় সক্ষম হন। কিন্তু লেপার্ড তাঁর একটি কব্জিতে কামড় বসিয়ে দিলে, আর সেই কামড়ে তাঁর কব্জির হাড় গুঁড়িয়ে যায়।

এক হাতেই র‍্যাট্‌ট্রে তাঁর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। লেপার্ড সেই হাতের কব্জিতেও কামড় বসিয়ে দেয়। র‍্যাট্‌ট্রে শক্তিহীন হয়ে পড়লেন। কিন্তু লেপার্ডটাও ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিল যে তার এই শত্রুটি সাধারণ নয়। তাই শত্রুর সঙ্গে রণে ক্ষান্ত দিয়ে গলার চাপ আল্‌গা হতেই সে সরে পড়ল 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করে।

র‍্যাট্‌ট্রে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে টল্‌তে টল্‌তে তাঁর বাহনের কাছে ফিরে এলেন। বহু কষ্টে তার পিঠে চাপলেন। পোষা জন্তুটি মনিবকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসে। তার লাগাম ধরে ঠিক মতো চালনা করার শক্তিও তখন র‍্যাট্‌ট্রের ছিল না, তাঁর হাত দুটি অকেজো হয়ে দু'পাশে লট্‌পট্‌ করে ঝুলছিল।

ক্যাম্পে ফিরতেই মার্টিন জনসন তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা র‍্যাট্‌ট্রের করলেন অর্থাৎ ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। তারপর যত তাড়াতাড়ি পারেন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। র‍্যাট্‌ট্রেকে চিকিৎসার জন্য ন' মাস হাস্পাতালে থাকতে হয়েছিল। তার থেকেই বোঝা যায় তিনি কী পরিমাণ আহত হয়েছিলেন।

চিকিৎসার পরে তিনি আবার আগের মতোই বলশালী হয়ে উঠলেন। কিন্তু কব্জি দুটি আর বেঁকাতে পারতেন না। যা হোক,

শক্ত মুঠিতে কোন কিছু চেপে ধরতে পারতেন এবং কনুই থেকে হাতটা বেঁকাতে পারতেন। মোট কথা, লেপার্ডের সঙ্গে খালি হাতে ওই দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরেও তিনি এক শক্ত সমর্থ পুরুষরূপে পুরানো ক্যাম্প-জীবনে ফিরে এলেন।

কিন্তু এসে দেখলেন যে ষোলটি সুন্দর জেব্রা নিয়ে তিনি তাঁর ভাগ্য ফেরাবেন বলে মনে করেছিলেন, তার মধ্যে মাত্র ছটি জীবিত আছে। তাঁর ক্যাম্পের বাসিন্দা স্থানীয় লোকেরা মনে করেছিল যে তাদের কর্তা আর জীবিত ফিরে আসবেন না, কিংবা বরাতক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও জঙ্গল-জীবনে ফিরে আসার বদলে পঙ্গু দেহ নিয়ে শেষের কটা দিন নিজের দেশেই কাটাবেন। তাই তারা জেব্রাগুলোকে মেরে মাংস খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। র‍্যাট্‌ট্রের বরাত ভাল যে ওই ছুটিও মানুষের পেটে যাওয়ার আগে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

র‍্যাট্‌ট্রের সঙ্গে আমরা কয়েকদিন কাটালাম। দড়ির ফাঁস দিয়ে তাঁর বুনো জেব্রা ধরা দেখে আমরা অবাক হলাম। তাঁর মুখে তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা শুনলাম। তিনি বেড়া-ঘেরা এক 'কারাল' নির্মাণ করে তার মধ্যে জেব্রার পালকে খেদিয়ে নিয়ে আসবেন, যেমন ভাবে ভারতে হাতির পালকে খেদায় ধরে বশ মানানো হয় অনেকটা সেই রকম।

তারপর আমরা গন্তব্যস্থল স্থির করলাম অ্যাবিসিনিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি। সেখানকার বনভূমিতে আমাদের ক্যামেরার উপযুক্ত বিষয়বস্তু পাওয়া যাবে। সর্বশেষে আবার আমরা শহুরে জীবনে ফিরে আসব এবং মোম্বাসা থেকে কয়েকদিন পরে আমি জাহাজ ধরব।

অ্যাবিসিনিয়া সীমান্ত সম্পর্কে র‍্যাট্‌ট্রে আমাদের এক মজার গল্প শোনালেন। ওই দেশের বন্য উপজাতিদের স্বভাব হচ্ছে অন্ধকার রাতে সীমান্ত পেরিয়ে এসে কেনিয়ার কিকুউ বা লুম্বোয়া উপজাতির

গরুর পাল চুরি করে নিয়ে যাওয়া। এই চৌর্যবৃত্তি বেশ লাভজনক।
কেনিয়ার গ্রামবাসীরা নিরীহ লোক, লড়াকু জাত নয় বলে এর কোন প্রতিবিধান করতে পারে না।

নাইরোবির কর্তারা মাঝে মাঝে আদিম-আচাবার সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠায়। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না।

যা হোক, একদিন সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল যখন নাইরোবির কর্তাদের কাছে ক্রুদ্ধ অভিযোগ এল যে কারা অ্যাবিসিনিয়ায় হানা দিয়ে তাদের গরু-হরণ করে চলেছে।

পুলিসকে সতর্ক করে দেওয়া হলো। কয়েক দিন পাহারা দেওয়ার পর তারা রিপোর্ট দিল যে এই ধরনের চুরির কোন লক্ষণই তারা খুঁজে পায় না এবং সমস্ত ব্যাপারটাই অ্যাবিসিনিয়ার মনগড়া কথা।

কিছুকাল সব চুপচাপ থাকে। তারপর আবার ঘন ঘন প্রতিবাদ-পত্র আসতে থাকে। সেইসব পত্রে জানানো হয় যে সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে বহু গরু তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সেগুলি নিশ্চিতভাবে অদৃশ্য হয়েছে কেনিয়াতে।

এর ফলে গভর্ণর মনে করেন কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি নিজেই ওই অঞ্চলটা পরিদর্শন করবেন স্থির করলেন। কেনিয়া ও অ্যাবিসিনিয়া সীমান্তের মাঝে লেক রুগেলফে ক্যাম্প করে থেকে তিনি স্বচক্ষে দেখবেন দুই রাজ্যের মধ্যে কী ব্যাপার ঘটছে।

কেনিয়াতে ফ্ল্যাশ অ্যালেক ও অনেস্ট জন নামে দুজন তরুণ ছিলেন। তাঁরা সকলের অজান্তে পরিকল্পনা করলেন যে অ্যাবিসিনিয়াকে তারই শেখানো চালাকীতে টিট্ করবেন।

অবশ্য অ্যাবিসিনিয়াকে অনুকরণ করার এই কাজটা খুবই বিপজ্জনক। কারণ ধরা পড়লে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হবে। অ্যাবিসিনিয়ানরা বেশ নির্দয় নিষ্ঠুর।

যা হোক, ওই তরুণ দুটি খুবই তাড়াতাড়ি তাদের বরাত ফিরিয়ে

নিতে লাগলেন। তাঁদের বন্ধুরা চিরাচরিত প্রথায় পশুপালন ও প্রজনন করে, শিশল বা কফি চাষ করে অর্থোপার্জনে যত সময় ব্যয় করত, তারচেয়ে কম সময়ে অনেক বেশি অর্থ দুজনে উপার্জন করতে লাগলেন।

একদিন দুজনে যখন তাঁদের গোপন কার্য সাধনে বের হবেন ঠিক করছেন, তখন তাঁদের কানে এল যে গভর্ণর এই অঞ্চলে এসে কয়েক মাইল দূরে ক্যাম্প স্থাপন করেছেন।

খবরটা তাদের খুব বিচলিত করে না। কারণ তাদের সমস্ত মন-প্রাণ সেদিন রাতের একটি বড় ব্যাপারে নিবদ্ধ ছিল। গভর্ণরের আগমনে ভয় পেয়ে তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা পরিত্যাগে প্রস্তুত নন।

তাই যে বিরাট এক পাল গরুকে তাঁরা হরণ করবেন বলে মনস্থ করে রেখেছিলেন, সেই পালকে তাড়িয়ে কেনিয়া সীমান্তের এই পারে নিয়ে এলেন এবং সকালের আগেই উপত্যকার গভীরে এক গোপন খাটালে গরুগুলিকে লুকিয়ে ফেললেন।

প্রাতবাশ সেরে ঘোড়ায় চেপে তারা গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কথায় কথায় জানালেন যে তাঁরা এখানে বড় বন্যপ্রাণী শিকারে এসেছেন এবং সেদিন পর্যন্ত যা শিকার করেছেন তার বর্ণনা দিলেন। গরু চোরদের কাণ্ডের জন্য গভর্ণরকে যে মুস্কিলে পড়তে হয়েছে তাতে তাঁরা সহানুভূতি জানালেন। গভর্ণর তাঁদের ডেরাতে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন এবং তাঁরাও ডিনারের উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যথা সময়ে এসে গভর্ণরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে কৃতার্থ হলেন।

যা হোক, ওটাই তাঁদের শেষ কীর্তি। তাঁরা ধারণা করলেন যে দেশটা বড় বেশি সভ্য হয়ে উঠছে, এ ধরনের কার্যকলাপ এখানে আর করা চলবে না। তারপর তারা শীঘ্রই সে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন নতুন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে।

আমাদের ফেরার সময় একদিন সন্ধ্যায় আমরা খুব খারাপ এক

পথ ধরে আসছিলাম। বি. এফ. খুব আস্তে ও সাবধানে ওভারল্যাণ্ডটা চালাচ্ছিল। ব্রিয়ারলে, র‍্যাট্‌ট্রে ও আমি গাড়ির পিছনে পায়ে হেঁটে চলছিলাম।

হঠাৎ ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম পথের ধারে একটু দূরে বড় ধূসরাকৃতির কী একটা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মাথাটা আমাদের দিকে ঘোরাতেই বুঝতে পারলাম যে ওটা একটা গণ্ডার।

আমি সামনে দৌড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে ভারী রাইফেলটা তুলে নিলাম।

—'সাবধান। সামনে একটা গণ্ডার।' আমি বি. এফ.-কে বলি।

সে গণ্ডারটাকে আগে দেখতে পায়নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কী করতে চাও?'

আমি জবাব দিলাম, 'যদি প্রয়োজন হয় গুলি করব।'

'আচ্ছা, খুনী লোক তো তুমি!' সে গর্জে উঠল। 'একটু আগে একটা হরিণ মেরেও তোমার আশ মেটেনি।'

সত্যিই আমি আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে এক ডুইকার শিকার করেছিলাম।

ঠিক সেই সময় গণ্ডারটাও আমাদের দেখতে পেল। সে তার বিরাট দেহটা ঘুরিয়ে আমাদের মুখোমুখি দাঁড়াল। বি. এফ. এবার বুঝতে পারল সেটা কত কাছাকাছি রয়েছে। সে গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল, যাতে কোন রকম শব্দে বা নড়াচড়ায় গণ্ডারটি উত্তেজিত না হয়ে ওঠে। বি. এফ.-এর পক্ষে এটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল। এই জাতের প্রাণীরা রেগে না গেলে আক্রমণ করে না।

আমরা নীরব নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে বিরাটাকার জন্তুটির দিকে চেয়ে রইলাম। ঘোৎ করে এক ডাক ছেড়ে সে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর

ধীর পদে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। আমার একমাত্র আফশোষ যে তখন ছবি তোলার মতো যথেষ্ট আলো ছিল না।

যা হোক, ছবি তোলার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, যখন রাতটা কাটাবার জন্য আমরা ব্রিয়ারলের বন্ধু এক কফি-প্ল্যান্টারের বাংলোয় হাজির হলাম। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কয়েক সপ্তাহ ক্যাম্পে কষ্টকর জীবন কাটানোর পরে গরম জলে স্নান, পরিষ্কার জামাকাপড় ও ভাল রান্না করা আহার পেয়ে আমরা খুবই আরাম বোধ করলাম।

যখন তাঁকে গণ্ডারের ভাল ছবি তুলতে না পারার আমার দুঃখের কথা জানালাম, তিনি আশ্বাস দিলেন যে খুব সহজেই এই দুঃখ দূর করা যেতে পারে। সেখান থেকে সামান্য কয়েক মাইল দূরে কেনিয়া পর্বতের পাদদেশে বিস্তৃত তৃণভূমি আছে যেখানে প্রচুর গণ্ডার বাস করে। আমি চাইলে তিনি ভাল গাইডের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং সে নিশ্চয়ই আমায় গণ্ডার দেখিয়ে দেবে।

আমি খুব খুশি হলাম এবং তাঁকে ব্যবস্থা করে দিতে বললাম।

পরদিন তাঁর সহিস আমাকে এক ছোট গ্রামে নিয়ে গেল, সেখানে স্থানীয় শিকারী বাস করে। আমরা যে রকমটি চাইছিলাম, লোকটি ঠিক সেই রকমই। সে তার হাতের তালুর মতোই জঙ্গলকে জানে, বন্য জন্তুর পদ চিহ্ন সম্পর্কেও সে একজন বিশেষজ্ঞ।

আমরা যে সময় উপস্থিত হলাম, তখন তার স্ত্রীদের মধ্যে একজন তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছিল। একটি মাটির পাত্রে হলদে কাদা গুলে তার কোঁকড়ানো চুলগুলি সেই তরল রঙে রঞ্জিত করে দৃঢ় বিনুনী বেঁধে দিচ্ছিল।

মাথার এক দিকটা শেষ করে অন্যদিকের প্রসাধনে স্ত্রী ব্যস্ত থাকে। এক গাদা হলদে কাদা তার কপাল বেয়ে নাক ও দু গালের উপর গড়িয়ে পড়ে। তাকে এক হাস্যকর কিম্ভূত-কিমাকার জীবের মতো দেখায়।

যা হোক, তার কাছে কোন আয়না না থাকায় সে নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে তা জানতে পারে না, আর জানতে পারলেও সম্ভবতঃ অন্যের মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেপরোয়া। আমাদের সঙ্গী হওয়ার কথা শুনে সে প্রসাধনকার্য অসমাপ্ত রেখেই লাফিয়ে উঠে পড়ল। আমাকে গণ্ডারের কাছে ঠিক পৌঁছে দেবে জানাল। তার ধারনা হল যে আমি গণ্ডার শিকার করতে চাই।

গণ্ডার মারা হলে স্থানীয় লোকেরা তার দেহের সব মাংস খেয়ে নেয়, চামড়া ফালি করে কেটে 'সাজাম্বোক্স' অর্থাৎ ভয়ানক চাবুক তৈরি করে আর শিংটা গুঁড়িয়ে পাউডার করে, তাদের ধারণায় যা হচ্ছে অত্যন্ত যৌনশক্তি বর্ধক।

গণ্ডার শিকার না করে শুধু ছবি তোলার কথা আমি তাকে জানাই না। কারণ আমার এ কাজে শিকারীরা খুশি হবে না। আত্মরক্ষার জন্য আমি সঙ্গে ভারী রাইফেল রাখি। আমার আসল উদ্দেশ্য টের না পেয়ে এবং সঙ্গে রাইফেল দেখে শিকারীটি খুশিই হলো।

এই গ্রাম্য লোকদের নিয়ে সর্বক্ষেত্রেই কিছু মুস্কিল হয়। প্রথম হচ্ছে এদের সময় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। দূরত্ব সম্বন্ধেও তাই। ফলে আমায় যতটুকু সময়ের মধ্যে যতটা দূরে যাবার কথা বলেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি দূরে আমায় যেতে হয় এবং সময়ও বেশি লাগে। ফলে গণ্ডারের বিচরণভূমিতে যখন আমরা পৌঁছোলাম তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

যা হোক, অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সব প্রচেষ্টার পুরস্কার আমরা পেলাম। লম্বা ঘাসের মধ্যে আমরা গণ্ডারের গমনাগমনের পথ খুঁজে পেলাম। আমরা বড় জন্তুর ঘোরা ফেরার জন্য বনমর্মর ধ্বনিও শুনতে পেলাম, কিন্তু পরিষ্কার কিছু দেখতে পাই না।

সঙ্গের শিকারীদের গাছে উঠে চারপাশ দেখতে বললাম। কিছু দূরে একটু খোলা জায়গায় তারা একটি গণ্ডারের দর্শন পেল। উঁচু

গাছের ডালে নিরাপদ দূরত্ব হতে তারা ইঙ্গিতে আমাকে গণ্ডারের দিকে পরিচালিত করে। তাদের কোন ভাবনা নেই, যা কিছু ভয়-ভাবনা মাটিতে অবস্থিত আমার।

তাদের ইঙ্গিত মতো আমি খুব সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোই। হঠাৎ গণ্ডার ও আমি যুগপৎ পরস্পরকে দেখতে পেলাম। সে ঘুরে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। আমি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে থাকি। গণ্ডারটা আমার থেকে পনেরো গজেরও কম দূরে লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

আমার বাঁ হাতে রাইফেল তৈরি ছিল। আস্তে আস্তে ঘাড়ে ঝোলানো ক্যামেরায় গণ্ডারটাকে ফোকাশের মধ্যে আনলাম। খুব সন্তর্পণে স্যাটার টিপলাম।

হঠাৎ জানোয়ারটার কাছে জঙ্গলে কিসের একটা খস্‌খস শব্দ হলো। সে ঘাড় ঘুরিয়ে শব্দটা শোনে। আমার প্রতি তার আগ্রহ অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। বিষুবরেখায় সন্ধ্যা ছটায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। গোধূলির আলো বলে সেখানে কিছু নেই।

আমার সঙ্গী শিকারীরা খুবই উত্তেজিতভাবে তাড়াতাড়ি তাদের গাছ থেকে নেমে এল। তাদের ভোজের জন্যে আমি গণ্ডারটাকে বধ না করায় তারা খুবই নিরাশ হয়।

যা হোক, আমি তাদের বলি যে আর একটা গণ্ডারের সন্ধান করা যাক। কিন্তু আমার প্রস্তাবে তারা রাজি হয় না। সন্ধ্যার পরে জঙ্গলে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব বলে জানাল, কারণ রাতে জঙ্গলে ভূতের রাজত্ব শুরু হয়। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জঙ্গল থেকে পালানো উচিত।

আমাকে ওই কথা জানানোর পর তাদের একজন আমার রাইফেলটা টেনে নিল এবং সকলে মিলে জঙ্গল পরিত্যাগ করার

জন্য দ্রুতগতিতে যাত্রা শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে তাল রাখার জন্য প্রায় দৌড়াতে হয়, কারণ আমাকে ফেলে রেখে যদি তারা চলে যায় তাহলে অন্ধকারে পথ চিনে আমি কিছুতেই গ্রামে পৌঁছুতে পারব না।

প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল আমাদের 'ভূতের রাজ্য' সেই ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে।

'ভূতের রাজ্যে'র সীমানা পেরিয়ে তারা তাদের গতি কমায়, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে। আরও ঘণ্টা খানেক লাগল আমাদের নিজের ডেরায় পৌঁছোতে।

এই জংলি মানুষগুলি অদ্ভুত! তারা সিংহ হাতি চিতা গণ্ডার বাইসন প্রভৃতি কোন বন্য জন্তুকে ভয় করে না, অথচ অন্ধকার রাত হলেই ভূতের ভয় করে।

দিন দুয়েক পরে আমরা নাইরোবি পৌঁছোলাম। আমাদের ভ্রমণ শেষ হলো। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি মোম্বাসার ট্রেনে চাপলাম। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডের জাহাজ ধরলাম।

# বরফ শিলায় মৃত্যুর হানা

[ উত্তর-মেরু অঞ্চলে বহু বৎসর বাস করার ফলে লেখক অনেকবার শ্বেত-ভল্লুকের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণের মধ্যে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে শ্বেত-ভল্লুকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—ধূর্ততা, হিংস্রতা, দুঃসাহসিকতা, সন্তান-স্নেহ ইত্যাদি। ]

আমরা যখন উত্তর সাগরের তীরভূমির বরফাবৃত সমতল অঞ্চল হতে তুষার শৈলমালার দিকে অগ্রসর হই, তখন সঙ্গী এস্কিমোটি তীক্ষ্ণ স্বরে আমাদের সতর্ক করে দিল।

আমি তার ফারের পোষাকে আবৃত দেহের পিছনে থাকায় মুখটা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। তা সত্ত্বেও চকিতে যেটুকু দেখতে পাই, তাতেই টের পেলাম সেখানে ভীতির ছাপ ফুটে উঠেছে। একটা ভাল্লুক তার দিকে ছুটে আসছে।

আমরা সীল মাছের সন্ধান করতে গিয়ে ভাল্লুকের সম্মুখীন হলাম!

প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে তুষারবৃত স্থানে আমরা বুকে হেঁটে এগোচ্ছিলাম। বাতাসের সঙ্গে ছুটে আসা তুষারকণা আমাদের অনাবৃত মুখে কশাঘাতের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। আমরা অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছিলাম একটি বস্তুর জন্যে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে। বস্তুটি হচ্ছে কালো রংয়ের অদ্ভুত আকারের নিদ্রিত সীল মাছ। ভাল্লুকটারও নিশ্চয় একই ধ্যান-ধারনা ছিল—সীলের দর্শন লাভ।

যা হোক, সে এস্কিমোর একেবারে মুখোমুখি হবার আগে পর্যন্ত আমাদের দেখতে পায়নি, মানুষের গায়ের গন্ধ পায়নি, নড়াচড়া ও কথার আওয়াজ শুনতে পায়নি। তার আক্রমণের আভাস আমরাও পাইনি।

এক মুহূর্ত আগেও আমরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছিলাম আমাদের চোখ কান ও মন সীলের উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ রেখে, আর পর মুহূর্তে হঠাৎ ওডল্যাটেটাক দেখল যে এক ভয়ংকর দর্শন মেরু-ভল্লুক আক্রমণের জন্য তেড়ে আসছে। তার বিরাট হলদে বাহু দুটি প্রসারিত করেছে মল্লযোদ্ধার মতো, সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে উদ্যত।

আমার মনে আছে ওডল্যাটেটাককে দেখেছিলাম তার রাইফেল ওঠাতে, কিন্তু ভাল্লুকটা একেবারে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল। তার থাবার একটি চপেটাঘাতে ওডল্যাটেটাকে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল। তারপর সে আমার পাশ দিয়ে চোখের পলক ফেলার আগে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বিরাট দেহ নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে তার গমন পথের দিক হতে ভূপতিত আমার এস্কিমো বন্ধুর দিকে তাকালাম।

ওডল্যাটেটাকের আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। ভাল্লুকের নখ তার ফারের পোষাক ভেদ করে কাঁধে এক অগভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। যদিও সে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল, কিন্তু ঘটনাটা আমার মনে রীতিমত নাড়া দিয়ে গেল।

সুমেরু অঞ্চলে বিশ বৎসরকাল ভ্রমণের ফলে 'নানুক' ( এস্কিমো ভাষায় পুরুষ শ্বেত ভাল্লুককে বলা হয়, স্ত্রী ভাল্লুক হচ্চে তায়ার্ক ) সম্পর্কে আমার মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় এবং সেই শ্রদ্ধা নেহাৎ সামান্য নয়।

সার্কাসের ক্লাউনের মতো আমি তাকে মজা করতে দেখেছি। উঁচু বরফ স্তুপের উপর থেকে ছেলেদের 'স্লিপ-খাওয়ার' মতো বসে নিচে নামতে দেখেছি, মুখে দাঁত বের করা একগাল হাসি, হাত-পা শূন্যে আন্দোলিত। আমি তাকে দেখেছি খালি কেরোসিনের টিনের কাছে এসে মহানন্দে লাথি মারতে, যেমন গলির মধ্যে ছেলেরা ফুটবল বা তার বিকল্প কোন কিছু নিয়ে মেতে ওঠে। আমি দেখেছি দু'

পায়ে ভর দিয়ে আট-ফুট উচ্চতা নিয়ে ভয়ানক ঘোৎ-ঘোৎ গর্জন করে একশো ত্রিশ পাউণ্ড ওজনের তিনটে বাক্স বিরাট থাবায় তুলে তুষার শৈলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে। আবার কখনও দেখেছি রাগে ক্ষেপে ওঠা বাচ্চা ছেলের মতো বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে পাথরে চড় মেরে নিজেরই থাবার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলতে, কারণ সীল মাছ তাব হাত ফস্কে পালিয়ে গেছে।

স্পিট্জবার্জেন হচ্ছে আংশিক তুষারাবৃত মেরুদ্বীপ পুঞ্জ, যা মেরু-বিন্দুর মধ্যে দিয়ে পাঁচশো মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চল। এক সময় ওই অঞ্চলে আমি ছিলাম। সময়টা ছিল জুন মাসের মাঝামাঝি। সাদা বরফের ছোট ছোট খণ্ড ভেসে বেড়ায় ফিজোর্ডের নীল জলে, যেন জুয়েলারের গ্লাসকেসে কুশানের উপর রক্ষিত রত্নরাজি। ফিজোর্ডের ওপরে বরফের টুপি পরা চ্যাপ্টা মাথা পাহাড়গুলি থেকে লম্বমান তুষার-রেখা যেন আঙুল দিয়ে আকাশকে ছোঁয়ার চেষ্টা কবছে। মধ্যরাতের সূর্যের রক্তিমাভা হিমবাহকে রাঙিয়ে দিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস আমার 'পার্কা'রের নেকড়ের লোমগুলিতে মৃদু আন্দোলন জাগাচ্ছে। বাতাসটা কনকনে হলেও তীব্র নয়, শান্ত। আমি নীরব নিস্পন্দ হয়ে বসে একটি সীলের উপর লক্ষ্য রেখে ছি। তুষাররেখা যেখানে মূল ভূখণ্ডকে ছুঁয়েছে, সীলটা সেখানে শুয়ে আছে।

হঠাৎ আমার সারা দেহ অসাড় হয়ে গেল। আমি দেখতে পেলাম মূল ভূখণ্ডের দিকে যেতে এক শ্বেত-ভল্লুকের আকস্মিক আবির্ভাব! সন্তর্পণে সে সীলটার দিকে এগিয়ে আসছে। বরফে মাথা গুঁজে, পেট ঘসড়ে সে সামনে এগোয়।

প্রায় প্রতি আধ মিনিট অন্তর সীলটা যখন মাথা তুলে দিগন্তের দিকে দেখে কোন বিপদ ঘনাচ্ছে কিনা, তখন ভাল্লুকটা সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহকে একেবারে অচল বরফ খণ্ডে পরিণত করে। সীলটা স্বস্তিভরে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে, ভাল্লুক ফের গুঁড়ি মেরে সামনে অগ্রসর হয়। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে সে এগিয়ে চলে।

সাধারণতঃ ভাল্লুক তার লক্ষ্যের থেকে যখন মাত্র কয়েক গজ দূরে পৌঁছায়, তখনই বিদ্যুতের গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু এই ভাল্লুকের কাছে আজকের দিনটা বোধ হয় শুভ নয়। সে যখন তেড়ে গেল, তখন সীলটাও হঠাৎ ক্ষিপ্রবেগে বরফ থেকে গড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিল এবং নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজের ব্যর্থতায় প্রচণ্ড ক্ষোভে ও ক্রোধে ভাল্লুকটা তার ডান হাতের থাবা দিয়ে কাছের এক পাথরে চড় মারল, একেবারে উন্মাদের মতো কাণ্ড।

কিছুদিন আগে আইস-ফিজোর্ডের নরওয়েজিয়ানদের এক ক্যাম্পে হঠাৎ খুব গোলমাল বেঁধেছিল। আমরা জনা-ছয়েক বসে গল্প করছিলাম, এমন সময় চিৎকার, গালাগাল ও বাসন পত্তরের ঝনঝানি শোনা গেল।

আমাদের রাঁধুনী স্বেন জ্যাকবসন রেগে ক্ষেপে ছুটে এল। রান্নাঘরের দরজার বাইরে রাখা আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর ভাণ্ডারে এক ভাল্লুক হানা দিয়েছে।

জ্যাকবসন চেঁচিয়ে চলল, 'আমি ভাল্লুকের সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলাম—একটা বিরাট ভাল্লুক! ব্যাপারটা মোটেই মজার নয়।'

গোলমালে ভাল্লুকটা তল্লাট ছেড়ে পালায়।

আমাদের মাংসের সঞ্চয় যখন কমে আসে, তখন স্বেন একদিন বন্দুক নিয়ে বের হলো সীল মারতে। কিন্তু স্বেন সীলের বদলে একটা ভাল্লুক শিকার করে নিয়ে এল।

স্বেন আমাদের বলল, 'ভাল্লুকটার একটা হাতের হাড় ভাঙা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডান থাবাটা?'

স্বেন মাথা নেড়ে জানাল ঠিক।

আমি বুঝতে পারলাম কোন্ ভাল্লুকটাকে সে শিকার করেছে।

মেরু প্রদেশের উপকূল অঞ্চলে, যেখানে তুষার শৈল খণ্ড ভেসে বেড়ায়, পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে খণ্ড-বিখণ্ড হয়, সেখানে লোকদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে যে সম্পর্কে আলোচনা হয় তা হচ্ছে, ওই সব তুষার শৈলের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ানো মেরু-ভাল্লুকেরই কাহিনী।

এস্কিমো ও সাদা-মানুষেরা নানুকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের নানা গল্প বলে। কারণ মেরু-প্রদেশে তুষারাবৃত অঞ্চলের বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝে ভাল্লুকের গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়। ভাল্লুককে নিয়ে আলোচনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে তার মাংস এস্কিমোদের খাদ্য তালিকার একটি প্রধান অঙ্গ। আমার খাদ্য তালিকাতেও সেটি ক্রমে ক্রমে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল।

মেরু অঞ্চলে নবাগতকে একটি বিষয়ে সাবধান করে দিই। ভাল্লুকের লিভারটা খাওয়া উচিত নয়। এতে এত বেশি ভিটামিন এ আছে, যে প্রচণ্ড অসুখ করতে পারে; এমন কি মৃত্যুও হতে পারে, যদি আহারকারীর স্বাস্থ্য ঠাণ্ডা ও ক্ষুধায় আগের থেকেই ভেঙে গিয়ে থাকে। মাংস ও চর্বি খাদ্যের পক্ষে ভালই। লোমে ঢাকা চামড়া গরম পোষাক ও বিছানা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়, বাতাস ও বরফের হাত থেকে রক্ষা করে।

তুষার-শৈল প্রান্তরে যাযাবর এই নানুক সম্পর্কে সহৃদয় মন্তব্যে বিরত কোন সাদা চামড়ার মানুষকে আমি সুমেরু অঞ্চলে কখনও খুঁজে পাইনি। নানুকের আচার-ব্যবহারের মধ্যে বেশ কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে।

শোনা যায় সীলের পিছনে সন্তর্পণে ধাওয়া করার সময় সে তার থাবা নাকের কাছে তুলে ধরে।

কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, 'কেন?'

এক সাদা-চামড়ার শিকারী আমায় জানিয়েছিল, 'মেরু ভাল্লুকদের হ্যালিটোসিস আছে। তার মানে সীল মাছ খাওয়ার জন্য নিশ্বাসে

দুর্গন্ধ। তার এই নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ যাতে শিকার টের না পায় সেজন্য নাকের সামনে সে থাবা তুলে ধরে।

সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'আমার কথা খাঁটি সত্যি। অবশ্য তার কালো নাকটা সাদা বরফের ওপর দূর থেকে দেখা যায় বলেও সে নাক ঢাকার জন্য থাবাটা তুলে ধরে।'

আমি প্রথম এই কথাটা শুনেছিলাম আর্টিক-কানাডার উত্তর-পূর্ব কূলে এক ইগ্‌লুতে বসে। কথাটা শুনে আমি মনে মনে হেসেছিলাম, ভেবেছিলাম লোকটা বেশ গুল-গল্প শোনাচ্ছে। কিন্তু পরে এই একই কথা অন্যদের মুখে এতবার শুনেছি যে মনে হয় এর পিছনে সত্য আছে।

মেরু-ভল্লুকের জীবনে শীতকালটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর ঋতু, এটা আমি টের পেয়েছি। শ্বেত ভল্লুকরা একক জীবনেই অভ্যস্থ। নানুক ও তায়ার্ককে একত্রে আমি প্রথম বসন্তে প্রায়ই দেখতে পেতাম। শরৎকালে আবার তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করত। এরা বরফস্তূপে সাধারণতঃ দক্ষিণমুখো গর্ত খুঁড়ে বাসা বানায়, তারপর বাসায় ঢোকার গর্তটা ধীরে ধীরে বরফ পড়ে যাতে ঢাকা পড়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখত। গর্তের মধ্যে নিজেরা স্বেচ্ছায় বন্দী হতো বাইরের শীতের হিমশীতল মরণ-স্পর্শ এড়াবার জন্য। মাথার কাছাকাছি বরফে একটু ছোট ফুটো সৃষ্টি করে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে নিতো।

ইয়োকোন টেরিটারিতে আমি প্রথম শুনেছিলাম নবজাতক মেরু-ভাল্লুকের বাচ্চাকে বেড়াল-ছানার মতো মাপের বলে বর্ণনা করতে। সেখানকার হোয়াইট-হর্স বারে জিম সাইমুর নামে এক বৃদ্ধ শিকারী কথাটা আমায় বলেছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড ও সার্বোণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রায় পঞ্চাশ বছর হলো তিনি সভ্য-জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে উত্তর-মেরু অঞ্চলে বাস

করছেন। মেরু-ভল্লুক সম্বন্ধে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন, সে ভাষা লোকে সাধারণতঃ খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সম্পর্কেই করে।

তিনি হেসে বলেন, 'আপনি জানেন, আমি শ্বেত-ভাল্লুক মারা বা ধরা একেবারেই পছন্দ করি না। কারণটা কী তা জানি না, তবে এ-কথা বলতে পারি যে তারা সাধারণতঃ খুব সচ্চরিত্রের প্রাণী। উত্তরাঞ্চলে আসার পর আমি তাদের খুব ভালভাবে জেনেছি।'

তিনি আমায় বলেন যে একদিন তাঁর কুকুরেরা একটি বড় স্ত্রী ভাল্লুককে মৃতাবস্থায় তার গুহার মধ্যে দেখতে পায়।

'তার তিনটি বাচ্চা ছিল। বাচ্চারাও মারা গেছে। মা গুহার দেওয়ালে হেলান দিয়ে এমন ভাবে বসা যে দেখলে মনে হবে ঘুমোচ্ছে। তার মাথাটা তার বিশাল বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বাচ্চা তিনটিকে কোলের ওপর দু' হাতের থাবা দিয়ে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে আছে। যে বিষয়টা আমায় সবচেয়ে অবাক করেছিল, তা হচ্ছে প্রকৃতি বাচ্চাকটিকে এমন ক্ষুদ্রাকারে সৃষ্টি করেছে যে মার কাছে তারা কখনো দৈহিক বোঝা স্বরূপ হবে না, বিশেষ করে শীতকালীন দীর্ঘ ঘুমের সময়।'

প্রায় দু হাজার মাইল দূরে পুবদিকে, হাডসন বে এর তীরে ফোর্ট চার্চিলে তেতারটুকি নামে এক এস্কিমো ভল্লুক-জননী সংক্রান্ত কাহিনীকে আর একটু বর্ধিত করে দেয়।

'স্ত্রী-ভাল্লুকরা মা হিসাবে খুবই ভাল। এস্কিমো-মায়েদের চেয়ে কিছু কম নয়। বাচ্চা-ভাল্লুকরাও খুব সুন্দর। বাচ্চা-ভাল্লুককে এস্কিমোরা বলে 'নন্নুয়াক'।'

'বাচ্চা ভাল্লুক', সে বলে চলে, 'খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। সে যত বড় হয়, মা ইগলুকে তত বড় করে। সে বরফে বড় গর্ত খোঁড়ে। সে নান্নুয়ার্ককে একবারেই ছেড়ে থাকে না। সারা শীতকাল কাছে রাখে।'

আরও পুবদিকে, ফ্রেবিশের উপসাগরের ব্যাফিন দ্বীপে টেড ম্যাকলারেন নামে একজন আমায় শুনিয়েছিল একবার কী করে তার কুকুরেরা ভাল্লুকের গুহার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। গুহার থেকে চারটে ভাল্লুক বেরিয়ে পড়ে পালিয়েছিল।

'চারটে ভাল্লুক', সে দৃঢ়স্বরে বলল, 'একবাবে চার-চারটে ভাল্লুক। একটা মাদী, আর তার সঙ্গে তিনটে। ওই তিনটে এককালে ছোট বাচ্চা ছিল, কিন্তু তখন বেশ বড় হয়ে গেছে। সেই দিনটা খুবই বিশ্রী ছিল। প্রায়ই ঝড় উঠছে। তীব্র বাতাস আলগা বরফ জমি থেকে তুলে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। বাতাসে ওড়া-বরফ হাঁটু সমান উচ্চতা থেকে ক্রমশ আরও উপরে উড়ছে। আমার মনে হয় আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিংবা এও হতে পারে ঠাণ্ডায় আমি ঝিম মেরে যাচ্ছিলাম। যা হোক, আমার বেশ কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝতে যে ওগুলি ভাল্লুক, আমার ক্লান্তিভরা চোখের ঘোর নয়।'

ক্যাম্পে ফিরে টেড তার ভাল্লুক দেখার কথা এস্কিমোদের শোনাল।

তারা বলল, 'আপনি ঠিকই দেখেছেন। তুষার-ঝড়ের মধ্যে চোখের ভুল নয়। এটাও কিছু অসাধারণ নয় যে মার সঙ্গে ধেড়ে ছেলেরাও রয়েছে। মা যদি অন্য কোন পুরুষ ভাল্লুকের কাছে না যায়, তাহলে বাচ্চারা দু বছর পর্যন্ত মার কাছ ছাড়া হয় না। আমাদের আদুরে ছেলেদের মতো ভাল্লুকেরও ধেড়ে খোকারা মার আদর খেতে ভালবাসে।

মার ন্যাওটা ধেড়ে ভাল্লুকদের কথা শুনে টেড তো হেসে বাঁচে না।

'প্রত্যেক ভাল্লুকের একটা নিজস্ব গুহা থাকে এবং আশপাশের অন্য সব গুহার সঙ্গে যোগাযোগের সুড়ঙ্গও থাকে। মানুষরা যেমন ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে, ওরাও তেমনিভাবে বাস করে। যখন কুকুররা এসে ওদের বিরক্ত করে, তখন ওরা আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

তুষার ঝড়ের মধ্যে হঠাৎ চারদিকে ভাল্লুক দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে দেখা যায়। কাকে প্রথমে তাড়া করবে তা বুঝতে না পেরে কুকুরেরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়।'

শীতকালে এস্কিমো শীকারীরা তাদের কুকুরের পাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ভাল্লুকের আস্তানার সন্ধানে। বাতাসে নাক উঁচু করে কুকুরগুলি ভাল্লুকের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে। বায়ু চলাচলের জন্য ভাল্লুকেরা তাদের মাথার উপরে যে গর্ত করে, সেটাই তাদের বিপদের কারণ হয়।

আমি দেখেছি হঠাৎ কোন কুকুর উত্তেজিত হয়ে বরফের মধ্য দিয়ে ছুটে গিয়ে এক জায়গা আঁচড়াতে থাকে। কেপ্‌ক্রেবিউ উপকূলের কাছে একদিন খুব বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছিল।

অ্যাবেনাসে এক মোটা এস্কিমোর সঙ্গে আমি ছোটখাট ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। সেদিন তাপমাত্রা বোধহয় শূন্যাঙ্কের বিশ ডিগ্রি নীচে ছিল। সাইবেরিয়ার দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ছুটে আসছিল। আমার কানের ডগায় বরফ কণা জমছিল। গাল দুটি অসাড় হয়ে আসছে টের পাচ্ছিলাম। মুখমণ্ডলেও সাদা বরফের আস্তরণ পড়ছিল।

শীতকালের শেষের দিক। আকাশ সীসার বর্ণ। বরফপাতের আশংকা আছে। আমি মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিই সুমেরু অঞ্চলে ভ্রমণ করে বেড়ানোর জন্যে, যখন আমার উচিত ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে বসে 'সান-বাথ' করা।

অকস্মাৎ অ্যাবের কুকুরগুলি উত্তেজিত হয়ে চিৎকার শুরু করে দিল। তাদের দলনেতা অল্প ধূসর ও কালো রংয়ের এক কুক্কুরী দিক পরিবর্তন করল এবং গতিবেগও বাড়িয়ে দিল।

অ্যাবের মধ্যেও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। শিকারীরা শিকারের সময় যেমন ক্ষিপ্র ও মারাত্মক হয়ে ওঠে, সেও তেমনি হয়ে

উঠল। সে স্লেজ থেকে লোহার আঁকশি ছুঁড়ে দিল বরফে। ঝাঁকুনি দিয়ে স্লেজ থেমে যায়, আর ঝাঁকুনিতে আমি ছিট্‌কে পড়ি। অ্যাবে দৌড়ে গিয়ে তার দুটি কুকুরের বাঁধন খুলে দিল।

কুকুর দুটো সামনে দৌড়ে গিয়ে এক বরফের স্তূপ আঁচড়াতে লাগল। বাকি কুকুরগুলো ভীষণ ঘেউ-ঘেউ শুরু করে দিল। তাদের জিভ লক্‌লক্‌ করে, মুখ দিয়ে লালা ঝরে, কামড়াবার জন্যে যেন ভীষণ ব্যগ্র।

অ্যাবে তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে কয়েক জায়গা তাড়াতাড়ি নিশানা করে গুলি ছুঁড়ল। একটি ভাল্লুক তার গুহা থেকে বেরিয়ে এল। দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘোৎ-ঘোৎ করে তেড়ে আসে। কিন্তু বন্দুক হাতে এস্কিমো যখন ভাল্লুকের সঙ্গে লড়ে তখন জয় তার নিশ্চিত। বন্দুকের বদলে তার কাছে হারপুন বা ছুরি, কিংবা ইগলু তৈরির জন্য বরফকাটা ছুরি মাত্র সম্বল হলে ব্যাপারটা অনেক সময় অন্য রকমও ঘটে যায়। তখন ভাল্লুকের বদলে এস্কিমোরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়।

শীতকালে এস্কিমোদের আহার্য মাংস খুবই দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। হিমশীতল বায়ু বল্গা হরিণ প্রভৃতি প্রাণীদের এ অঞ্চল হতে পালাতে বাধ্য করে। উপকূল অঞ্চলে বাতাস বরফস্তূপ গড়ে তোলে, ফলে সীল মাছ সেখানে থাকতে না পেরে সমুদ্রের গভীরে চলে যায়। এস্কিমোরা প্রায় অনশনের মুখোমুখি হয়।

এই রকম অবস্থায় পরিবারস্থ লোকদের মুখে আহার জোগানোর জন্য এস্কিমো পুরুষ হারপুন হাতে নিয়ে ভাল্লুকের আস্তানার সন্ধানে বের হয়ে পড়ে। সন্ধান পেলে ভাল্লুকের সঙ্গে তার সংগ্রাম হয়, আর এই সংগ্রামে জয়ী হলেও সে যে ক্ষতবিক্ষত হবে এটা প্রায় নিশ্চিত।

এস্কিমো-শিকারী অ্যাঙ্গলাভিক্‌ এবং কুডলাকের কাহিনী আমি শুনেছি।

কানাডার মেরু অঞ্চলে কেমব্রিজ বে-এর কাছে এক ইগলুতে আমি অ্যাঙ্গলাভিকের কাহিনী শুনেছিলাম। সে এক ভাল্লুকের আস্তানায় ঢুকেছিল আর ভাল্লুকটা থাবার আঁচড়ে তার রগ থেকে চিবুক পর্যন্ত মুখের ছাল চামড়া উপড়ে দিয়েছিল।

বার্টার দ্বীপ ও ম্যাকেঞ্জি ব-দ্বীপের অসংখ্য খালের মধ্যবর্তী নির্জন আলাস্কা উপকূলের অধিবাসী কুডলাক ভাল্লুক শিকারে বেরিয়ে যখন ঘরে ফিরল, তখন দেখা গেল ভাল্লুকের মাংস ও চামড়া নিয়ে ফেরার সাথে সে একটি হাতও ভাল্লুকের নখে ফ্যালা ফ্যালা করে চিরিয়ে নিয়ে ফিরেছে।

আমি আর এক এস্কিমোর কথাও শুনেছি, যে একেবারে আক্ষরিক অর্থে ভাল্লুককে তাব শিরশ্ছেদ করতে দিয়েছিল। এই ভয়ংকর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আমায় বলেছিল, 'নানুকের বাসায় ঢুকতে গিয়ে এস্কিমো পা পিছলে পড়ে। ভাল্লুকের হাঁ করা মুখে মাথাটা পড়ে।'

বর্ণনাকাবী নিজের কাঁধে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল। এস্কিমোরা জন্মকে যে ভাবে মেনে নেয় মৃত্যুকেও সেইভাবে মানে। সে ধীরে ধীরে বলে, 'নানুক মুখটা বন্ধ করল।'

কাঁধে আর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সে একেবারে চুপ করে গেল।

আমার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্যে একটির ঘটনাস্থল হচ্ছে ওয়েনরাইটের এস্কিমো গ্রামের কাছে। গ্রামটি হচ্ছে কোট্‌জিবিউ-এর মতো আলাস্কা উপকূলে, সাইবেরিয়ার তুষার-সমুদ্রের পারে।

আমি এক এস্কিমোর সঙ্গে ভ্রমণ করছিলাম, যাকে পাদ্রীরা খ্রীশ্চান করে নাম দিয়েছেন উইলিয়াম। সে বেশ ভাল লোক, বলবান, স্বল্পভাষী, খোশমেজাজী এবং সাহসী। সে তার কুকুরের দল নিয়ে এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভ্রমণকালে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল আমি তার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক কিনা। আমার আগ্রহ

কোন বাধা মানে না। তার স্লেজ টানার জন্য সাতটা কুকুর বেঁধে নিয়ে আমরা রওনা হলাম।

প্রথম কয়েক মাইল বেশ সুন্দরভাবে যাওয়া গেল। বরফের উপর দিয়ে কুকুররা কাপড় ছেঁড়ার মত শব্দ করে স্লেজটা টেনে নিয়ে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস আমার গাল দুটি যেন ঠুকরে দেয়, পার্কার লোমগুলি আমার মুখমণ্ডল থেকে পিছনে ঠেলে দেয়। কুকুরগুলি বেশ মেজাজে স্লেজ টেনে চলে। বাতাসে জড় করা বরফকণার স্তূপের উপর দিয়ে স্লেজটা যখন লাফিয়ে নেচে চলে তখন ছোট ছেলের মত খুশিতে আমরা হাসাহাসি করি।

এক উপসাগর পার হয়ে আমরা এক ছোট শৈলান্তরীপের দিকে যখন অগ্রসর হই, তখন ক্রমশঃ জমাট বরফের বদলে খণ্ডিত বরফ রাশি দেখতে পাই। তুষারাবৃত অঞ্চল পেরিয়ে আমরা জমিতে পৌঁছোলে স্লেজটা হুড়মুড়িয়ে হঠাৎ এগিয়ে যায়, ফলে পিছনের কুকুরটা লাগামে জড়িয়ে পড়ে এবং স্লেজের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যায়। একটা হৈ হৈ ব্যাপার ঘটে। উইলিয়াম সামনে ছুটে যায় লাগামের ফাঁস যাতে পিছুনের কুকুরটাকে মুক্ত করে কুকুরগুলির মধ্যে কামড়াকামড়ি বন্ধ করতে। দুর্ভাগ্যক্রমে স্লেজটা ঘাড়ে পড়ায় পিছনের কুকুরটির একটি পা ভেঙে যায়।

উইলিয়াম তার কুকুরগুলিকে খুবই ভালবাসে। সে তাদের ভাল খেতে দেয়, নিজের খাবার তাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, অসুখ করলে সেবা করে। কিন্তু ভ্রমণকালে যখন কোন কুকুরের পা ভাঙে, তখন তাকে গুলি করে মারা ছাড়া করার কিছুই থাকে না। তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে উইলিয়মকে তার বন্দুকটা হাতে তুলে নিতে হলো।

কিন্তু ট্রিগার টেপার সাথে সাথে তার পুরানো বন্দুক চুরমার হয়ে গেল। এটা এক দারুণ দুর্ভাগ্য।

কারণ একটি প্রিয় কুকুরের ক্ষতির সঙ্গে মূল্যবান প্রয়োজনীয় অস্ত্রটিও গেল। তারপর আরও দুর্ভাগ্যের শুরু হলো, যখন অন্য

কুকুরগুলো চিৎকার করতে করতে আমাদের টেনে নিয়ে গেল শীতকালীন দীর্ঘ নিদ্রায় মগ্ন এক ভাল্লুকের গুহার কাছে।

শ্বেতাঙ্গদের সুমেরু অঞ্চলে পদার্পণের আগে এস্কিমোরা ভ.ল্লুকের সঙ্গে লড়াই করতো হারপুন আর ছুরি নিয়ে। পশুর থাবা ও নখের সঙ্গে মানুষের সেই সংগ্রাম অনেকটা হাতাহাতি লড়াইয়ের মতো ছিল। উইলিয়াম এখন সেইভাবে লড়াইয়ের জন্যেই প্রস্তুত হলো। সে ভাল্লুকের গুহার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের কুকুরগুলি উত্তেজিত হয়ে ঘেউ-.ঘেউ ডাক শুরু করে দিল। ভাল্লুকের তুষার-গৃহের দেওয়ালে উইলিয়াম তার হারপুন চালাল। ভাল্লুকটা রাগে ঘোৎ-ঘোৎ করতে করতে বেরিয়ে এসে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল আক্রমণের জন্যে। উইলিয়াম আবার হারপুন চালায়। কুকুরগুলিও ভাল্লুকটার চারদিকে ঘিরে ধরে। ভাল্লুকের মনোযোগ তাদের দিকে আকর্ষিত হলো। সে নবাগত শত্রুর দিকে ঘুরে দাঁড়াল তাদের সঙ্গে লড়বার জন্যে এবং উইলিয়ামও সুযোগ পেয়ে গেল তাকে বধ করার।

শ্বেত-ভাল্লুকেরা সারা শীতকাল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। তাদের দেহের ঘন চর্বি দীর্ঘকাল অনাহারে থাক সত্ত্বেও তাদের বাঁচিয়ে রাখে এস্কিমোদের কুকুরগুলি তাদের মোটা লেজে নাক ঢেকে ইগলুর আশপাশে বরফের মধ্যে যেমন আরামে ঘুমোয়, ভাল্লুকরাও তেমনি অলস আরামে কাল কাটায়।

দীর্ঘরাত্রি শেষে নীচের শেষ ভাগে ফিরে আসা সূর্যের প্রথম ক্ষীণ আলোক রশ্মি দিগন্তের পারে যখন দেখা দেয়, তখন নানুক তায়ার্ক ও তাদের বাচ্ছাদের ঘুম ভাঙার সময়। গভীর নিদ্রাশেষে তন্দ্রাজড়িত তাদের স্থির দেহ নড়েচড়ে ওঠে।

বসন্ত···উষ্ণতা···খাদ্য! হাল্কা ঘুমের মাঝে বোধ হয় স্বপ্ন দেখে। সূর্য আর একটু ওপরে ওঠে। ভাল্লুকেরাও আড়মোড়া ভাঙে, হাই

তোলে। তারপর তারা ঘুম থেকে উঠে থাবা দিয়ে তাদের ঘরের একদিকের দেওয়াল ভেঙে একে একে বাইরে বেরিয়ে এসে বসে, যেমন ঠিক আমরা ঘরের বারান্দায় বসে নিশ্চিন্ত আরামে সকালটা কাটাই।

বাচ্ছাগুলো তাদের চারধারে সাদা বরফে ঢাকা অসীম জগৎ দেখে ভয় পেয়ে মার গা ঘেঁষে বসে নাকি-কান্না শুরু করে দেয়। মার লোমে ঢাকা নরম বড় বড় পায়ের তলায় তারা লুকিয়ে থাকতে চায়। মা উঠে চলাফেরা শুরু করলে তখনও তারা মার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। মার পায়ের ফাঁকে, পেটের তলায় তারা ঘুর-ঘুর করার চেষ্টা করে। মা ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্য সবুজ ঘাস-পাতা মূলের সন্ধানে বের হয়, বাচ্চাগুলো কাঁদতে কাঁদতে মার পিছু নেয়। মানুষের ছোট শিশুরা যেমন মার কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করে আবদার করে ঠিক তেমনি ধারা। ঘণ্টা দুয়েক পরে সারা পরিবার ফিরে আসে তাদের সেই দেওয়াল ভাঙা উন্মুক্ত আস্তানায়। আহার অন্বেষণের সময়টা ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে। তারপর এপ্রিল মাস এলে ভাল্লুক পরিবার তাদের শীতকালীন আস্তানা ত্যাগ করে উপকূলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

এই রকম এক অভিযাত্রী ভাল্লুককে আমি প্রথম দেখছিলাম তোটজেবিউ-এর কাছে সাগরের উপর জমা বরফের মধ্যে দিয়ে যেতে। আমি বরফের ধার দিয়ে চলছিলাম ভাসমান বরফ স্তূপের কিছু ভাল ছবি তোলার জন্যে। হঠাৎ কুয়াশার আবরণ ভেদ করে এক বিরাট ভাল্লুকের আবির্ভাব!

এস্কিমোরা ভাল্লুক দেখতে পেলে কুকুরগুলিকে লেলিয়ে দেবার জন্য 'নানুক, নানুক' বলে যেমন তীক্ষ্ণ চিৎকার করে, তার আর প্রয়োজন হলো না। আমার সঙ্গী কুকুরগুলি উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। তাদের সামলাতে আমি হিমসিম খাই।

সময়টা ছিল বসন্তের শেষ ভাগ। চারধারে বরফগলা জলে

ছোট ছোট জলাশয় সৃষ্টি হয়েছিল। কুকুরগুলো যাতে শ্লেজটাকে আর না টানতে পারে, সেজন্য সেটাকে পাশ ফিরিয়ে যখন তাদের নিরস্ত করলাম এবং সামনে পথ দেখিয়ে-চলা কুকুর দুটির বাঁধন খুলে দিলাম, তখন আমি একেবারে আপাদমস্তক ভিজে গেছি।

আমাদের দেখতে পেয়ে ভাল্লুকটা পিছন ফিরে জলাশয়ের মধ্যে দিয়েই দৌড় মারল। ছাড়া পাওয়া কুকুর দুটি তার পিছু নিল।

আমি শ্লেজটা ঠিক করে নিয়ে সেটার উপর চাপলাম। বাকি কুকুরগুলো এবার লাফাতে লাফাতে সামনে এগোয়। বরফ ও জলের মধ্যে দিয়ে শ্লেজটা বোঁ-বোঁ করে ছোটে চারদিকে বরফ ও জলের কণা ছিটিয়ে।

সঙ্গে বাচ্চা না থাকলে শ্বেত-ভাল্লুকরা মার্জার জাতীয় প্রাণীর মতো লাফাতে লাফাতে ছোটে, কিন্তু তাদের মতো বেগবান সে নয়।

সাধারণতঃ কুকুরেরা যখন দৌড়ে ভাল্লুকের নাগাল পায়, তখন শিকারী সেখানে না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা তাকে ঘিরে রাখে। কিন্তু আমার এই 'শিকার' চিরাচরিত প্রথায় হলো না।

ভাল্লুকটা পাড়ের বরফ পেরিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি যখন পাড়ের কাছে পৌঁছালাম তখন ক্রুদ্ধ কুকুর দুটি এদিকে-ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে এবং তাদের সারমেয় ভাষায় ভাল্লুকটিকে তীব্র গালাগালি দিচ্ছে। ওদিকে ভাল্লুকটা তখন নির্বিঘ্নে ও নীরবে ভাসমান এক বরফস্তূপের উপর উঠে কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুন্দর স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালে মেরুদেশের এই মহারাজ বরফ খণ্ডেই বাস করেন। বাচ্চারা তাদের মার কাছে শিকার করা শেখে। আমি এস্কিমোদের মুখে শুনেছি যে সীল বা সিন্ধুঘোটক শিকারের সময় বরফ খণ্ডকে কীভাবে মুগুরের মতো ব্যবহার করতে হয়, মা তাদের সেই শিক্ষা দেয়। অবশ্য এই উচ্চ-পর্যায়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে

সন্দেহের অবকাশ আছে। যা হোক, এটা কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে যে শ্বেতভাল্লুকরা অনেক সময় তাদের শিকার করা প্রাণীকে পিঠে বহন করে নিয়ে যায়। পোর্ট চার্চিলের একজন এস্কিমো দাবী করে যে, সে স্বচক্ষে দেখেছে ভাল্লুক একটা সীলকে ঘাড়ে করে নিয়ে চলেছিল।

এই ঘটনা লোকটির মনে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে। তাকে দেখা মাত্রই ভাল্লুক নিজের কাঁধের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার দিকে তেড়ে এসেছিল। হতভম্ব এস্কিমোটির ভাগ্য ভাল তাই ভাল্লুক যে বরফ খণ্ডটির উপর ছিল, সেটি তার গতিবেগে কাৎ হয়ে যায় এবং ফলে তাকে পিছলে জলে পড়ে যেতে হয়। লোকটিও ইতিমধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পিট্টান দেয়।

হাডসন বে এলাকায় এমন লোক আছে যারা ভাল্লুকটার ওই ভাবে জলে পড়ে নাকানি চোবানি খাওয়ার কাহিনী নিয়ে আজও হাসাহাসি করে।

শ্বেত ভাল্লুক ক্ষুধার্ত হলে সীলের পিছনে যেমন সন্তর্পণে অনুসরণ করে, ঠিক তেমনি সন্তর্পণেই মানুষের পিছু নেয়। নরওয়েজিয়ান শিকারী জ্যাকেন পূর্ব গ্রীনল্যাণ্ডের ভাল্লুকদের ভাল করেই জানে। সে আমায় বলেছিল যে বরফের মধ্যে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত এক এস্কিমোকে সে একবার দেখেছিল। এক ভাল্লুক তাকে আক্রমণ করেছিল যখন সে বেচারা এক উন্মুক্ত স্থানে খেতে বসেছিল। বরফের উপর চিহ্ন দেখে বোঝা গিয়েছিল যে ভাল্লুকটা বুকে হেঁটে খুব ধীরে ধীরে এস্কিমোটির কাছে এগিয়েছিল এবং পদচিহ্ন দেখে এটাও বোঝা গিয়েছিল যে শিকারের নিকটস্থ হয়ে বাকি ব্যবধানটুকু সে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়েছিল।

চেস্টারফিল্ড ইনলেট-এর কাছে বরফখণ্ডের উপর চিহ্ন এক

ভাল্লুকের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট প্রমাণ করেছিল। চেস্টারফিল্ডের এক শিকারী আমায় বলেছিল, 'সীলের নিঃশ্বাস নেওয়ার গর্তে এক ভাল্লুককে মাথা ভেঙে আমি মারতে দেখেছিলাম।'

বোঝা গিয়েছিল যে এক পলাতক সীলকে ধরার জন্য সে ওই গর্তে মাথা ঢুকিয়েছিল। তারপর মাথাটা গর্ত থেকে আর বের করে আনতে পারেনি। তার বাচ্চাদের দেখা গিয়েছিল শ'খানেক গজ দূরে উপকূলে বসে জাম খাচ্ছে। মা তাদের সেখানে বসিয়ে রেখে বড় শিকার ধরতে গিয়েছিল।

হেনরি রুডি নামে এক বৃদ্ধ শিকারীর সঙ্গে আমার স্পিট্‌জবার্জেন ওয়াটার্সে দেখা হয়েছিল। সে আমায় হেসে বলেছিল, 'ভাল্লুকরা ভীষণ জাম খেতে ভালবাসে। কালো জামের সময় তাদের মুখ-গলা-ঘাড় সব জামের রসে রঙীন হয়ে যায়। সাদা দেহ আর বেগুনি মুখমণ্ডলে তাদের অদ্ভুত সুন্দর দেখায়।'

এই রুডির মুখ থেকেই আমি প্রথম শুনি ভাল্লুকের কৌতূহলী স্বভাবের কথা। বরফে পড়ে থাকা খালি টিনের কৌটো থেকে শুরু করে মানুষের কেবিন পর্যন্ত সে কৌতূহলবশে পরীক্ষা করে দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কেবিনের মধ্যে কী আছে দেখার জন্যে সে কেবিনে ঢুকে পড়ে সামনে যা পাবে তা তছনছ করবে। তারপর আরও কিছু পাওয়া যায় কিনা সেই সন্ধানে বিশাল দেহ নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবে।

স্পিট্‌জবার্জেন ও উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডের মধ্যে ভাল্লুকের 'গমনাগমন পথে' একদিন রাতে তুষার ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য রুডি ভাসমান বরফস্তূপে সাময়িকভাবে এক ইগলু নিজেই তৈরী করে নিয়েছিল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন রুডি অর্ধচেতনভাবে বরফস্তূপের নড়াচড়ার শব্দ শুনছিল। হঠাৎ ধুপ করে এক বিকট শব্দের সঙ্গে কেবিনের ছাদ ধ্বসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে রুডি একরাশ বরফের তলায় চাপা পড়ে যায়। দু হাতে বরফ সরিয়ে সে বের হয়ে আসে।

সে বলে, 'কে আমায় ওইভাবে বরফ চাপা দিয়েছিল, জানো? ভাল্লুক! সত্যি, এক বিরাট ভাল্লুক। আমি তাকে দেখলাম কুকুরের মতো দৌড়ে পালাতে। ব্যাটা ইগলুর মধ্যে কী আছে দেখার জন্যে ছাদে উঠেছিল। ছাদ ভেঙে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে পালাল।'

শরৎকাল থেকে দিন ছোট হতে থাকে। বাতাস বেগবান হয়ে ওঠে। তাপমাত্রা নামতে থাকে। আকাশ ধূসর বর্ণ ধারণ করে। সূর্যের ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। জল জমে বরফ হতে থাকে। খোলা সমুদ্র ক্রমশঃ তুষারে আবৃত হয়। মেরু-ঝঞ্ঝা মুক্ত অঞ্চলে ছুটে বেড়ায়।

তুষার অঞ্চলের মহারাজ শীতকালীন আস্তানার সন্ধানে সাগর থেকে ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করে। ভাল্লুক-মাতাও সন্তান প্রসবের জন্য আস্তানার খোঁজে চলে।

অল্পকাল পরে এ অঞ্চলে আর ভাল্লুক দেখা যায় না। অবশ্য মাঝে মাঝে দু' একটা ধেড়ে বজ্জাতকে চোখে পড়তে পারে। তারা তাদের আস্তানা থেকে কয়েক সপ্তাহ অন্তর বেরিয়ে পড়ে শূন্য তুষার প্রান্তরে 'ভ্যাগাবণ্ড লোফার'-এর মতো ঘুরে বেড়ায়। মেরু অঞ্চলের শীতের সুদীর্ঘ রাত্রির মাঝে তারা হচ্ছে যেন হেথা-হোথা ঘুরে বেড়ানো 'শাদা ভূত'।
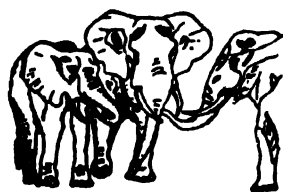
# লিফুম্বা লাগুন-এর নরখাদক

## (Killer of the Lifumba Lagoon)

[ একটি মানুষের মূর্খতা কী ভাবে এক সিংহকে নরখাদকে পরিণত করে এবং সারা গ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তারই সত্য বিবরণ। শেষে এক কিশোরের সিংহের কবলে পড়ার দুর্ভাগ্যে এবং তার মনিবের সতর্কতা ও সাহসে এই সন্ত্রাসের রাজত্ব শেষ হলো। লেখক বিশ্ববিখ্যাত অরণ্যপ্রেমী শিকারী জন টেলর। ]

যেখানে জাম্বেসী নদী লুপাটা গিরিখাতের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেখান থেকে ক্রমশঃ সমতল ভূমি বিস্তৃত হয়েছে। গিরিখাতের সর্বনিম্ন প্রবেশ পথের সাত-আট মাইল দূরে এবং নদীর উত্তর ধারে হচ্ছে লিফুম্বা লাগুন,—ইংরাজি এল অক্ষরের মতো এক হ্রদ। এল-এর বড় বাহুটি নদীর সঙ্গে এক সমকোণ সৃষ্টি করেছে।

লাগুনটি নদীর সঙ্গে এক সংকীর্ণ খালের দ্বারা যুক্ত। শক্ত বেতের মতো দীর্ঘ 'মাতেতি' গাছ ও লম্বা মোটা ঘাসে স্থানটি সমাকীর্ণ। গণ্ডারেরা এই ঘাস দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করার ফলে তাদের দেহভারে খালটি কিছু গভীরতা লাভ করেছে। তাই এই খালে বর্তমানে ক্যানো বা ছোট নৌকা চালানোও সম্ভবপর হয়েছে।

হ্রদের দুটি বাহু যে কোণ সৃষ্টি করেছে, সেই কৌণিক ভূমিতে খানিকটা গভীর জঙ্গল আছে। অবশ্য মাঝে মাঝে খোলামেলা

জায়গাও আছে। এখানকার মাটি হচ্ছে বালুকাময় ও প্রস্তরশূন্য। লিফুম্বা লাগুন-এর এল অক্ষরের দুই বাহু যেখানে যুক্ত হচ্ছে, সেখানে একটি ছোট দ্বীপ আছে। ওখানে সেটাই একমাত্র দ্বীপ, আর ওই দ্বীপে ছিল আমার অতি মনোরম 'বেস-ক্যাম্প'। জাম্বেসী নদী থেকে ওই বেস-ক্যাম্প প্রায় মাইল দেড়েক দূর।

নদীর বুকে এক জায়গায় বেশ বড় এক বালুকাময় চরভূমি আছে এবং স্থানীয় কিছু লোক ওই চরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ভয়ঙ্কর বন্যা না হলে চরের বাসিন্দাদের কোন ক্ষতির ভয় ছিল না।

জাম্বেসীর যে দ্বীপগুলি বর্ষাকালীন বন্যায় জলমগ্ন হয় না, সেগুলির কিছু কিছু জায়গায় প্রচুর মেতেতি জন্মায়, যাদের উচ্চতা বারো থেকে পনেরো ফুট; কখনো কখনো তারও বেশি। এই মেতেতি গাছের পাতার আগাগুলি খুবই সরু ও শক্ত, একেবারে ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ।

নদীর পাললিক কর্দমভরা জমিতে প্রতি বছরই খুব ভাল শস্য জন্মায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বন্যার জল সরে গেলে মহানন্দে চাষের কাজ করে। পশুপালনের কাজও তারা করে। তাদের সকলেরই কিছু ছাগল ও বেশ কিছু শুয়োর আছে। এক কথায় তাদের জীবন নিরুদ্বেগ, শান্তিপূর্ণ ও আনন্দময়!

নীচে সর্বদা তীব্র স্রোত থাকায় এবং বালুকাময় ভূমিতে কোন জল জমত না বলে ওই জায়গায় মশা ছিল না। মূল ভূখণ্ডের তিৎসি মশার ঝাঁক এদিকে আসে না, তাদের বাসোপযোগী ঝোপ বা ঘাস না থাকার জন্যে। এ সব ছাড়াও আর একটা কারণ হচ্ছে এখানে তেমন ঠাণ্ডা কখনো পড়ে না।

মাঝে মাঝে জলের গভীরতা অনুযায়ী সিংহ সাঁতার কেটে বা জল ভেঙে এখানে হাজির হয় ছাগল, বিশেষ করে শুয়োর খাবার লোভে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কখনো দ্বীপের মানুষদের ওপর নজর দেয়নি। আগন্তুক সিংহরা দ্বীপে দিনকয়েক বা বড় জোর

সপ্তাহখানেক থেকে আবার চলে যেত। কারণ দ্বীপের মানুষেরা সিংহের আগমন টের পেলে তাদের প্রিয় শুয়োরের পালকে খোয়াড়ে পুরে রেখে দিত। সিংহ বেচারা মনোমত খাদ্য না পেয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে যেত।

নদীর ওপারের চিফ্ অ পোস্ট (আমাদের দেশের থানার বড়বাবুর মতো সরকারী অফিসার) যিনি ছিলেন, তাঁর কানে এই দ্বীপে মাঝে মাঝে সিংহের আবির্ভাবের কথা পৌঁছায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তার মাথায় খেয়াল চাপল প্রকৃত বন্য সিংহের ভাল ক্লোজ-আপ ফটো তোলার। যদিও নদীর উত্তর ধার বা এই দ্বীপটা তাঁর এলাকার মধ্যে পড়ে না, তবুও তিনি এক আফ্রিকান পুলিস মারফৎ দ্বীপের মোড়লের কাছে হুকুম পাঠালেন যে দ্বীপে সিংহের আগমন ঘটলে তখনই যেন তাঁকে খবর পাঠানো হয়।

চিফ হচ্ছেন সাদা-চামড়ার মানুষ, তার উপর সরকারী অফিসার, তাই উত্তর পাড়ে পৃথক সরকার হলেও মোড়ল তাঁর হুকুম অবজ্ঞা করতে সাহস করে না।

পরের বার যখন সিংহ এসে একটি শুয়োর মারল, তখন মোড়ল সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে ক্যানোয় চড়ে নদী পেরিয়ে এই খবরটা চিফকে জানাতে পাঠাল। ঘণ্টা দুয়েক বাদ চিফ স্ব-শরীরে হাজির হয়ে হুকুম করলেন যে সিংহ যেখানে শিকার ধরেছে সেই স্থানটিতে তাঁকে নিয়ে যেতে।

স্থানটিতে যাওয়া খুব দুষ্কর নয়। কারণ পরিষ্কার সাদা বালিতে সিংহের পদচিহ্ন সহজেই অনুসরণ করা যায়। কিন্তু মোড়ল যখন চিফকে নিয়ে সিংহের শিকারের স্থানে পৌঁছল, তখন সে আহার সমাপ্ত করে লম্বা মেতেতির ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। সারাদিন সে সেখানে ঘুমিয়ে কাটাবে, কারণ মেতেতির ঠাণ্ডা ছায়াঘেরা জায়গায় কারও তাকে বিরক্ত করার কোন সম্ভাবনা নেই।

চিফ তাঁর সঙ্গে প্রায় আশি পাউণ্ড ওজনের সিংহ ধরার এক শক্তিশালী ফাঁদ এনেছিলেন। মেতেতি বনের কিনারে এক খোলা জায়গায় সিংহ যেখানে আহার করেছিল সেখানে তাঁর লোকদের দিয়ে ফাঁদটি পাতলেন। সিংহের মারা শুয়োরটির দেহের খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে দেখে চিফ মোড়লকে আর একটি শুয়োর জোগাড় করতে বললেন আর তার দাম তিনি দিয়ে দেবেন একথাও জানালেন। তাঁর কথা মতো শুয়োর আনা হলে সেই জ্যান্ত শুয়োরটিকে ফাঁদের কাছে বেঁধে রাখা হলো।

চিফ ভাবলেন সিংহ মেতেতির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেটুকু শুয়োরের মাংস সে আগে ফেলে রেখে গেছে তার সন্ধানে আসবে এবং তখন আর একটা শুয়োর দেখতে পেয়ে সে এসে সহজেই ফাঁদে পা দেবে।

চিফ পরদিন সকালে আবার আসবেন জানিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। যাবার আগে গ্রামবাসীদের সাবধান করে দিয়ে গেলেন যে সিংহ ফাঁদে পড়লে তারা যেন কিছু না করে। তাহলে সিংহ তার ফাঁদে আটকানো পাটাকেই দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পালিয়ে যাবে। এই ধরনের ইঁদুর কলের মতো ফাঁদে পড়লে সিংহ অনেক সময় ওই ভাবেই পালায়।

রাতের প্রথম প্রহরেই ফাঁদের দিক থেকে হঠাৎ সিংহ-গর্জন ভেসে এল। গর্জনের সাথে ঘন ঘন ক্রুদ্ধ হুংকারও শোনা গেল। বোঝা গেল ফাঁদের বাঁধা শুয়োরটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে হতভাগ্য পশুরাজ ফাঁদে বন্দী হয়েছেন।

পরদিন ভোরে গ্রামবাসীরা দল বেঁধে ব্যাপারটা দেখার জন্যে ফাঁদপাতা জায়গায় গেল। তারা দেখল সিংহ ফাঁদে ঠিক মতোই ধরা পড়েছে। মানুষ দেখে ক্রুদ্ধ সিংহ তাদের দিকে তেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ইস্পাতের মজবুত ওই ইঁদুরকল এক খোঁটার

সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে দৃঢ়ভাবে বাঁধা থাকায় সিংহের যা কিছু লাফ-ঝাঁপ তা ওই শিকলের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রইল।

মোড়ল কৌতূহলী দর্শকদের ওখান থেকে গ্রামে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং সাহেবের আগমণের প্রতীক্ষা করে। মোড়ল বোঝে যে সিংহ খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে শিকল টানাটানি করলে খোঁটা উপড়ে আসতে পারে, কারণ বালি-জমিতে খুব শক্তভাবে খোঁটা গাঁথা সম্ভব নয়।

নদীর অপর পারে আবার দূত পাঠানো হলো। ঘণ্টা দুয়েক পরে চিফ এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ক্যামেরা, রাইফেল আর দুজন স্থানীয় পুলিস, যাদের হাতিয়ার হচ্ছে মিলিটারির বাতিল করা সেকেলে বন্দুক। সিংহ যেখানে আবদ্ধ হয়ে আছে, সেখানে ওই তিনজন আগন্তুকের দলটি উপস্থিত হলো। চিফ যখন ফটো তোলার জন্যে সিংহের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হন, তখন সিংহও তাদের দিকে তেড়ে গিয়ে এক ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হুংকার ছাড়ল।

সিংহের সেই গর্জন শুনে চিফ তো ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়লেন আর তাঁর সঙ্গী দুটি পিছন ফিরে প্রাণপণে ছুট দিল। সিংহের ফটো তোলা আর হলো না। ক্যামেরা সেখানে ফেলে রেখেই ফটোগ্রাফারকে সরে পড়তে হলো।

তেড়ে যাওয়া সিংহকে পায়ের শিকল আবার টেনে ধরে রাখল। সে শুধু অসার তর্জন-গর্জন শুরু করল। কলের ধারাল দাঁতগুলি তার সামনের পায়ের থাবার তিন-চার ইঞ্চি উপরে কামড় বসিয়েছে। সে কামড় খোলা অসম্ভব। মুক্তির একমাত্র উপায় টানাটানি করে থাবাটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। অনেক সময় মুক্তি-পাগল সিংহ নিজেই নিজের পা কামড়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

এই কলগুলি খুবই সাংঘাতিক জিনিস এবং নরখাদক ও গৃহপালিত পশু হত্যাকারী জানোয়ারকে নিহত করা ছাড়া অন্যক্ষেত্রে কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। এই সিংহের জন্য ওই কল ব্যবহার করা

সম্পূর্ণ বে-আইনী কাজ হয়েছে, কারণ সে এখনো পর্যন্ত নরখাদক হয়ে ওঠেনি।

কিছুক্ষণ পরে এবং কিছু দূরে গিয়ে ধাতস্থ হওয়ার পরে চিফ স্থির করলেন যে সিংহটা যখন ভালভাবেই শৃংখলাবদ্ধ, তখন তাঁর ক্যামেরাটা ওখানে ফেলে না রেখে কুড়িয়ে আনাই ভাল। কিন্তু সিংহের কাছাকাছি গিয়ে তাঁর নিজের এই কাজ করার সাহস না হওয়ায় তাঁর সঙ্গী এক পুলিসকে ওটা নিয়ে আসার হুকুম দিলেন, আর তিনি নিজে রাইফেল বাগিয়ে ওই লোকটিকে 'কভার' করে রইলেন।

পুলিসটি দু হাতে ক্যামেরাটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে তার পুরানো বন্দুকটা অন্য পুলিসের হাতে দিয়ে ভয়ে ভয়ে সিংহের দিকে অগ্রসর হলো। সিংহ গর্জন করে তার দিকে আর একবার লাফ দিল। ভয়ংকর সেই গর্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। চিফ্ ঘাবড়ে গিয়ে সিংহকে গুলি করে বসলেন। কিন্তু ভয়ে ও উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপার ফলে রাইফেলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সিংহকে শুধু সামান্য আহত করল। গুলি খেয়ে কাবু না হয়ে সে আরও রেগে গিয়ে পিছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। কল সমেত সামনের পা শূন্যে আন্দোলিত করে সে ঘন ঘন গর্জন করতে থাকে। তার সেই ভয়ংকর রুদ্র মূর্তি দেখে ও গর্জন শুনে 'বন্দুকধারী তিন বীরের' হৃৎকম্প শুরু হয়। শীঘ্রই সেই হৃৎকম্প বন্ধ করার ওষুধ তথা পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হওয়ায় বীরপুঙ্গবরা তাড়াতাড়ি নিজেদের আস্তানায় ফেরার জন্যে ওই স্থান ত্যাগ করলেন।

পেট ভরে রুটি, সার্ডিন ও দু'এক গ্লাস মদ খাওয়ার পর সাহস ফিরে পেতে চিফ সিদ্ধান্ত করলেন শৃংখলাবদ্ধ সিংহকে তিনি শিকার করবেন এবং তারপর তাঁর যত ইচ্ছা ছবি তুলবেন। ফাঁদের শিকলটা বাদ দিয়ে ফটো তুললে সবাই মনে করবে সিংহ শিকারের মতো দুঃসাহসিক কাজেও তিনি পিছপা নন।

দু পাশে দুই বন্দুকধারী পুলিস সহ খুব সাবধানে তিনি ফিরে এলেন সেই জায়গায়, যেখানে তাঁর হাতে গুলি খেয়ে মরার জন্য সিংহটা অপেক্ষা করছে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু খুব বিস্ময়ের সঙ্গে—আর অন্ততঃ কিছুটা স্বস্তির সঙ্গেও—তিনি দেখলেন যে সিংহ স্থান ত্যাগ করে চলে গেছে এবং পদচিহ্নের সঙ্গে একটি পদ তথা থাবা সেখানে রেখে গেছে,—ওই কলের মধ্যে আটকানো অবস্থাতেই।

চিফ তাঁর ক্যানোতে চড়ে নদী পেরিয়ে যেখানে চলে গেলেন, সেখানে যাবার কোন সুযোগ সিংহটির নেই। অর্থাৎ তিনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু পিছনে রেখে গেলেন এক প্রতিহিংসা পরায়ণ ক্রোধোন্মত্ত আহত পশুরাজকে এমন এক জনবসতিপূর্ণ স্থানে, যেখানে তার শিকার করে আহার জোটাবার মতো কোন জন্তু নেই। আর সে রকম জন্তু যদি থাকত, তাহলেও থাবা বিহীন সিংহের পক্ষে তাকে বধ করা অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে সম্ভব নয়।

অবশ্য এইসব চিন্তা চিফের রাত্রের সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি, কারণ তাঁর মনে একবারও উদয় হয়নি যে তাঁর হটকারিতার ফলে একটি সাধারণ সিংহ ক্ষুধার জ্বালায় নরখাদক হয়ে উঠবে।

সিংহ তার ক্ষতস্থান শুকিয়ে একটু ভাল হওয়ার জন্য দিন পাঁচেক অপেক্ষা করল। তারপর ক্ষুধার জ্বালায় সে তার গুপ্ত আস্তানা থেকে বের হয়ে এল। ইতিমধ্যে সিংহের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে গ্রামবাসীরা তার কথা ভুলে গেল কিংবা ভাবল যে সে মূল ভূখণ্ডে নিজের জায়গায় ফিরে গেছে। যদি তারা দ্বীপের উত্তর দিকের তীরভূমিতে একটু অনুসন্ধান করত, তাহলে সেখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখতে পেয়ে সহজে বুঝতে পারত যে সে দ্বীপ ছেড়ে অন্য কোথাও যায়নি। এই সত্যের সর্বপ্রথম উপলব্ধি তারা করল

একদিন রাতে তাদের গ্রামের বা কারালের বাইরে ভয়ংকর সিংহ গর্জন শুনে। তারা যদি আগে থেকে জানত যে দ্বীপে সিংহ আছে, তাহলে তাদের শুয়োরগুলিকে নিরাপত্তার জন্যে খোয়াড়ে পুরে রেখে দিত। এই সতর্কতা তারা অন্য সময় অবলম্বন না করে শুয়োরগুলিকে ছেড়েই রেখে দেয় এবং বৃষ্টি না হলে নিজেরা খোলা জায়গার শুয়ে থাকে।

সেদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র থাকায় তারা দেখতে পেল যে সিংহটি এক ছোট শুয়োর মেরে মুখে করে নিয়ে পালিয়ে গেল। শিকার ধরার সময় সিংহ ডাকে না। কিন্তু এটি যে ডেকেছিল তার কারণ সম্ভবতঃ হচ্ছে প্রচণ্ড ক্ষুধার মুখে আহার পাওয়ার সম্ভাবনায় সিংহটি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এবং তার পায়ের ক্ষতের কথা ভুলে গিয়ে সেটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। থাবা না থাকা সত্ত্বেও অভ্যাস বশে থাবা মারতে গিয়ে ক্ষতস্থানে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে সে গর্জন করে উঠেছিল।

দ্বীপের অধিবাসীরা যখন জানল যে সিংহ দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়নি, তখন থেকে তারা তাদের শুয়োরগুলিকে প্রতি রাত্রে খোয়াড়ে বন্ধ করে রাখে। ছাগলগুলিকে তারা এমনিতেই রাতে কখনো ছেড়ে রেখে দিত না। তাই আহার্য পশু না পেয়ে পশুরাজ মানুষ খাওয়ার ব্রত গ্রহণ করল।

তা সত্বেও গ্রামবাসীদের কথা থেকে আমি বুঝেছি যে সিংহটির নরখাদক হওয়ার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না। মানুষের চেয়ে শুয়োর মারাই সে বেশি পছন্দ করত। মানুষ মারা শুরু করার পরও হঠাৎ কোন শুয়োর পেয়ে গেলে সে তাকে বধ করেই ক্ষুধা দূর করত।

সিংহ প্রথম যে মানুষটি মারে সে হচ্ছে এক বৃদ্ধা। সেই বৃদ্ধা জ্বালানি কাঠের সন্ধানে মেতেতি জঙ্গলের কাছে জলাভূমিতে গিয়েছিল। সিংহ সর্বশেষ যে শুয়োর মেরেছিল, তার তিনদিন পরে

ওই স্ত্রীলোকটিকে বধ করল। সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বৃদ্ধা চিৎকার করার কোন সুযোগ না পেলেও কাছাকাছি অন্য যে স্ত্রীলোকরা ছিল তাদের কানে সিংহের গর্জন পৌঁছেছিল। সম্ভবতঃ সিংহ আবার তার ক্ষত পায়ে আঘাত পেয়েছিল। সেই গর্জন শুনে স্ত্রীলোকরা যখন পুরুষদের ডেকে এনে বৃদ্ধার সন্ধান করেছিল, তখন আর তাকে খুঁজে পায়নি। ইতিমধ্যে সিংহ বৃদ্ধাকে মেতেতির গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আর এক কৃষ্ণপক্ষের রাতে সিংহ এসে এক কুটিরের নলখাগড়ার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গৃহের অধিবাসীদের মধ্যে একজনকে তুলে নিয়ে যায়। এখানকার কুটিরের দ্বারগুলি মোটেই সুদৃঢ় নয়, ভেতর থেকে আগড় দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু মাত্র ছোট লাঠির ঠেকা দিয়ে রাখা হয়। কারণ চুরি-ডাকাতির ভয় তো এখানে নেই।

সিংহ তার এই নিদ্রিত শিকারকে এত নিঃশব্দে ও দ্রুত মুখে তুলে নিয়েছিল যে লোকটি কোন আর্তনাদ করার অবকাশ না পেয়ে নিদ্রার মধ্যে চিরনিদ্রায় মগ্ন হলো। এমন কি তার পাশে শায়িতা তার নিদ্রিতা স্ত্রীও সিংহের এই নিঃশব্দ আবির্ভাব টের পেত না যদি না সিংহ রাগে আবার চাপা গর্জন করত। তার ক্ষতস্থানে বোধহয় এবারও ব্যথার উদ্রেক হয়েছিল। এই চাপা গর্জনে স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যেতে সে সভয়ে দেখল যে সিংহ তার স্বামীকে মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার তীক্ষ্ণ করুণ আর্তনাদ প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কিন্তু প্রতিবেশীরা কিছু করার আগেই সিংহ তার শিকার নিয়ে মেতেতির জঙ্গলে পালিয়ে গেছে।

এই মেতেতির জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করা খুবই দুরূহ কাজ। বাঁশঝাড় যেমন ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশ দ্বারা হয়, মেতেতির জঙ্গলও ঠিক তেমনি ঘন সন্নিবিষ্ট গাছে ভরা। আগেই বলেছি গাছের সরু পাতাগুলি ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ। এই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়া অবশ্য যায়, তবে খুব ধীরভাবে ও সন্তর্পণে।

এই ঘটনার পরে মোড়ল সকলকে ডাকে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য। এই গ্রামের মধ্যে একমাত্র মোড়লের কুটীরই যা একটু নিরাপদ। সে কুটীর নির্মাণের সময় মূল ভূখণ্ড থেকে শক্ত খোঁটা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু অন্যদের কুটীর বেশির ভাগই ওই মেতেত্তির দ্বারা নির্মিত বলে খুব নিরাপদ নয়। সিংহ ইচ্ছা করলে অতি সহজেই যে কোন কুটীরের ভেতর হানা দিতে পারে।

তাছাড়া এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তাদের কাছে কাঠ কাটার ছোট কুড়াল ছাড়া কিছু নেই। তু একজনের কাছে অবশ্য মাছ মারার বর্শা আছে, সেগুলির ফলা যে রকম তাতে মাছই মারা চলে, কোন জন্তু জানোয়ার নয়। ক্ষুধার্ত ক্রুদ্ধ সিংহের সামনে এদের ওই সব অস্ত্র ছেলেদের খেলনার মতোই অকেজো।

গ্রামবাসীদের আলোচনা সভায় তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে মোড়ল এক উপায় বাৎলায়। সিংহটাকে মেতেত্তির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দ্বীপ ত্যাগে বাধ্য করার জন্যে শিকারীদের 'জঙ্গল-পিটানোর' কৌশলটা তাদের গ্রহণ করতে হবে। যত ড্রাম ও টিনের ক্যানেস্তারা তাদের আছে, সেগুলি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে তারা মেতেত্তির জঙ্গলে ঢুকে সিংহকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে দ্বীপের শেষপ্রান্তে, যেখান থেকে সে মূল ভূখণ্ডে চলে যাবে।

মোড়ল নির্দেশ দিল যে পুরুষরা প্রথমে থাকবে আর তাদের পিছনে স্ত্রীলোকরা, তারা ওই গোলমালের সঙ্গে তাদের চিৎকার যোগ করবে। কিন্তু ছোট ছেলে কোলে নিয়ে কোন স্ত্রীলোকের যাওয়া চলবে না। কারণ বেতের মতো মেতেত্তি সরিয়ে একজন যাওয়ার পরে মেতেত্তি স্প্রিংয়ের মতো স্বস্থানে ফিরে আসার সময় পিঠে বাঁধা ছেলের চোখে-মুখে লেগে তাকে অন্ধ করে দিতে পারে। তাছাড়া অঘটন কিছু ঘটলে ছেলে সঙ্গে থাকলে মায়ের পালাতে অসুবিধা হবে।

সকলে মিলে সিংহ খেদানোর অভিযান শুরু করল। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে মেতেতির জঙ্গলের ঘনত্ব বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় অভিযানকারীদের লাইন ঠিক থাকে না, আগু-পিছু হয়ে যায় তারা। সমগ্র দলটি কারুরই দৃষ্টি পথে থাকে না, একজন বড় জোর তার পাশের জনকেই শুধু দেখতে পায়।

জঙ্গলের অর্ধেকটা যেতেই সিংহের সন্ধান পাওয়া গেল। যদিও কেউ তার দর্শন পেল না, তবু তার চাপা গর্জন কানে এল। ওরা দ্বিগুণ গোলমাল শুরু করে দিল। ওদের উৎসাহের মাত্রা বেড়ে গেল যখন সিংহের ডাক শুনে বুঝতে পারল যে সে তাড়া করা মানুষদের এড়াবার জন্য দ্বীপের সীমানার দিকেই এগিয়ে চলেছে। সব কিছুই তাদের 'পরিকল্পনা' অনুযায়ী হচ্ছে দেখে তারা খুব আনন্দিত হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত সিংহ দ্বীপের শেষ সীমায় পৌঁছল, তখন তার সামনে নদী ছাড়া আর কিছু নেই।

দ্বীপের বাসিন্দারা এর পূর্বে আর কখনও সিংহকে এমন কোণ-ঠাসা করেনি। যদি তারা সন্ধ্যার দিকে তাদের এই অভিমান শুরু করত, তাহলে সিংহ খুব সম্ভব নদী পেরিয়ে মূল ভূখণ্ডে চলে যেত। কিন্তু ঠিক দুপুর বেলা সিংহ তার চেনা আস্তানা ছেড়ে নদী পেরিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যেতে ইচ্ছুক হলো না। সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মানুষের বেষ্টনী ভেঙে পালাবার সংকল্প করল। যে মানুষটি দল ছেড়ে সিংহের পিছু পিছু অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, তাকে কোন রকম সতর্কতার সুযোগ না দিয়ে সিংহ অকস্মাৎ বিদ্যুৎ-বেগে আক্রমণ করে বসল।

হতভাগ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহ গগনবিদারী হুংকার ছাড়ল। এর ফলে সিংহের অনুসরণকারীদের মধ্যে দারুণ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। কী যে ঘটল কেউ ভাল করে বুঝতে পারলো না। দলের সামনে যারা ছিল তারা চিৎকার ও ঢাক বাজানো বন্ধ করে ভাল করে শোনার জন্যে কান পাতে, আর পিছনে যারা ছিল তারা মনে

করে সামনের লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই তাদের আরও বেশি হল্লা করা দরকার।

হৈ-হল্লার এই কমা-বাড়া থেকে সিংহ বোধহয় বুঝতে পারে যে তার পক্ষে পালাবার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সেই পথ ধরেই ফিরে যাওয়া। পুরুষদের লাইনের মধ্যে একজনকে মেরে সে যে ফাঁক সৃষ্টি করে নিয়েছে তারই সদ্ব্যবহার করল।

পুরুষদের লাইন নির্বিঘ্নে পেরিয়ে আসার পর শুধু দুটি স্ত্রীলোককে সে তার পথের সামনে দেখতে পেল। স্ত্রীলোক দুটি পরস্পরকে সাহস দেওয়ার জন্যেই খুব কাছাকাছি ছিল। হঠাৎ একেবাব সিংহের সামনে পড়ে যাওয়ায় তারা পিছনে ফিরে দৌড়তে শুরু করল। সিংহ তাদের একজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার যে থাবাটি অক্ষত আছে তারই এক ঘায়ে স্ত্রীলোকটির মাথাব খুলি চুরমার করে দিল। অন্য স্ত্রীলোকটিকেও সে আঘাত করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই আঘাত ছিল ওই বিক্ষত পদের। তাই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুমুখে না পড়ে শুধু মাটিতে পড়ে গেল।

সিংহ যে পুরুষটিকে প্রথমে আক্রেমণ করেছিল সে অবশ্য আক্রান্ত হয়ে চিৎকার করেছিল। কিন্তু চারদিকে এত গোলমাল হচ্ছিল যে তার এই চিৎকারকে অস্বভাবিক কিছু বলে কেউ বুঝতে পারেনি। যাহোক স্ত্রীলোক দুটি সিংহকে দেখেই ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটেছিল এবং তাদের সেই ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ আর্তনাদ সাধারণ গোলমালকে ছাপিয়ে সবার কানে পৌঁছেছিল। তৎক্ষণাৎ ঢাকের বাদ্যি ও অন্যান্য গোলমাল থামিয়ে কী হয়েছে জানার জন্যে ওরা পরস্পরকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা শুরু করে দেয়।

আর্তনাদকারী হতভাগ্য স্ত্রীলোক দুটির কাছাকাছি যারা ছিল, তারা মেতেতির ঘন যবনিকা সরিয়ে যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছলো, তখন আহত দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে এবং প্রথম জন নীরব নিস্পন্দ হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে।

এই দেখে ওদের সিংহ খেদানোর কাজ বন্ধ হয়ে গেল। ওরা বুঝতে পারল যে সিংহ আর এখন তাদের লাইনের সামনে সেই লাইন ভেঙে পিছনে পালিয়েছে। এখন তাকে তাড়া দিলে সে গ্রামে গিয়েই ঢুকবে। ওরা তখন স্থির করল যে পিছন ফিরে আবার জঙ্গল না ভেঙে তীরভূমি ধরেই গ্রামে ফেরার, তাতে হাঁটাটা কম কষ্টকর হবে এবং সিংহের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হবে না।

এই সময় তারা সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত প্রথম মানুষটিকে দেখতে পেল। লোকটির এক পাশের কাঁধ থেকে আরম্ভ করে বুক পর্যন্ত মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে এবং একটি কানও সিংহের আঁচড়ে প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছে, সেটি মস্তক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হয়ে মাংসতন্তুতে ঝুলছে।

দিবা দ্বিপ্রহরে সিংহ খেদাতে গিয়ে তারা যে ভুল করছে তার মাশুল তাদের দিতে হলেও তাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সিদ্ধ হলো। সেই রাত্রে বা পরদিন রাত্রে সিংহ নিজের থেকেই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেল। এইভাবে তার দিবানিদ্রাকালীন শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় কিংবা শুধু ওই মেতেত্তির জঙ্গলের মধ্যেই গতিবিধি সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হওয়ায়, যেখানে তার আহার্য পশু নেই,—সম্ভবতঃ সে স্থানত্যাগের সিদ্ধান্ত করেছিল।

দ্বীপবাসীরা তার এই প্রস্থান সম্বন্ধে প্রথম আভাস পেল যখন তাদের কানে এল যে দ্বীপের ঠিক বিপরীত দিকে মূল ভূখণ্ডে এক নরখাদক সিংহের উৎপাত শুরু হয়েছে। যেহেতু এই অঞ্চলটা নরখাদক সিংহদের এলাকা নয় এবং তাদের স্মরণকালের মধ্যে তারা এখানে কোন নরখাদক সিংহের হানার কথা শোনেনি, তাই তারা সহজেই অনুমান করল যে ওই কুকীর্তি হচ্ছে সেই বিশেষ সিংহটিরই। দ্বীপবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল এবং মনে মনে আশা করল যে সিংহ আর দ্বীপে ফিরে এসে তাদের জ্বালাতন করবে না।

এই সমস্ত ব্যাপার আমি পরে জেনেছিলাম। দ্বীপে এই সিংহের আগমনের সময় আমি অন্য জেলায় পাগলা হাতি শিকারে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর আমি ফিরে আসি প্রতি বছর বন্য মহিষদের সঙ্গে আমার যে লড়াই করতে হয় সেই কাজে। ক্যানোয় চড়ে লিফুম্বা লাগুনের বেসক্যাম্পে যাওয়ায় আগে আমি এই দ্বীপে নামি একজনের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে আম পেঁয়াজ চাষের জন্যে প্রতি বছর বীজ সরবরাহ করি। চাষের ফসলের অর্ধেক ভাগ তাকে আমি দিই আর বাকি অর্ধেকে আমার সারা বছরের পেঁয়াজের প্রয়োজন মিটে যায়।

আমি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এক প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল ওই নরখাদকের সংবাদ দিতে। বেসক্যাম্পে মূল ভূখণ্ডের এই প্রতিনিধিদের আসার আগেই দ্বীপবাসীদের কাছ থেকে সিংহের কাহিনী আমি আগেই শুনেছিলাম। এটাই যে সেই সিংহ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার পদচিহ্নে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জন্তুটির সামনের একটি থাবা নেই।

নদীর যে খালটি লাগুনের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ বাণ্ডারী থেকে লপ্টা গিরিখাতের সর্ব নিম্ন প্রবেশ পথের মুখে প্রায় ছ-মাইল ব্যাপী এলাকা যেখানে গ্রামগুলিতে বহু লোক বাস করে। এই অঞ্চলের বহু মানুষ ও তাদের অনেক শুয়োর সিংহটি হত্যা করেছে। সেই সময় সর্দারের বাসস্থানের কাছাকাছি সিংহটি দৌরাত্ম্য করে চলেছে। আগের দিন রাত্রে সে একটি স্ত্রীলোককে ধরার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে কোন রকমে বেঁচে যায়।

স্ত্রীলোকটি অন্যান্য অনেকের মতোই মাটির থেকে ছ-সাত ফুট উপরে বাঁশের মাচায় নির্মিত এক কুটিরে বাস করত। এই অঞ্চলে মহিষের দল শস্যক্ষেতে হানা দেওয়ার জন্য লোকেরা ওই রকম টংয়ের উপর বাসা বেঁধেছিল। সে সবে মই বেয়ে উপরে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে যখন কুটীরের ভেতর প্রবেশ করতে যাবে, এমন সময় দেখতে পেল সিংহ লাফ দিয়ে তাকে ধরার জন্য গুড়ি মারছে।

অত্যন্ত উপস্থিতবুদ্ধি থাকার ফলে স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ এক বেতের চুপড়ি মাচার উপর থেকে নিচে ফেলে দেয়, চুপড়িটা সিংহের সামনে পড়ায় সে সেটিকে কোন খাদ্যবস্তু মনে করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্ত্রীলোকটি কুটিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজার নল খাগড়ার ঝাঁপটা ফেলে দেয় এবং এক মোটা খোঁটার ঠেকনা সেই ঝাঁপে দিয়ে দেয়।

যদি তার কুটীরটা উঁচুতে না হয়ে মাটির উপরে হতো তাহলে আত্মরক্ষার এই ব্যবস্থা একেবারেই কার্যকর হতো না। কিন্তু যে মাচার উপর কুটীরটা নির্মাণ করা হয়েছে, তার দেওয়ালগুলি এমনভাব তোলা হয়েছে যে সেখানে এক ফুট প্রস্থ জায়গাও নেই। ফলে সিংহটি লাফ মারলেও মাচার উপর তার দাঁড়াবার মতো কোন চওড়া জায়গা নেই। বন্য সিংহরা মই বেয়ে উঠতে জানে না, বিশেষ করে এই সিংহটির তো আবার সামনের থাবা নেই। তাই কোন কিছু সামনের দু পা দিয়ে আঁকড়ে ধরতেও সে অসমর্থ।

আমাকে অনুরোধ করা হলো আমি গিয়ে যেন তাদের সাহায্য করি। আমি তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। যদি কেউ কখনো নরখাদক সিংহের এলাকায় বাস করে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে থাকবে কী ভীষণ বিপজ্জনক সেই ব্যাপার। বিশেষ করে এই লোকগুলি সভ্যতার যে রকম আদিম অবস্থার মধ্যে বাস করে। আত্মরক্ষার জন্যে আগ্নেয়াস্ত্র তাদের নেই, বাসভূমির চারদিকে বন-জঙ্গল আর ঘন ঘাসের ঝোপ। ওই দীর্ঘ ঘাস আবার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলার উপযুক্ত তখনও পর্যন্ত হয়নি।

যদি আমি তাদের জীবন রক্ষার জন্যে এই অনুরোধ উপেক্ষা করতাম তাহলে আর কোনদিন আমি কোন আফ্রিকানের সামনে লজ্জা বিসর্জন দিয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারতাম না। আমি যাদের বন্ধু বলে মনে করি, সেই লোকদের সাহায্য করার আন্তরিক ইচ্ছার

সঙ্গে সিংহ শিকারের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমার আছে। তাই আমি কী করে তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করব ?

হ্রদের পাড় ধরে আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। ক্যানো থেকে নেমে প্রায় তিন মাইল দূরে সর্দারের কারালে আমরা উপস্থিত হলাম।

সর্দার ফেইরা মানুষটি দেখতে ছোট-খাট হলেও বৈশিষ্ট্যবিহীন নয়। দেহের হাড় চওড়া নয় বলে তাকে শীর্ণকায় মনে হয়, নাক মুখ যেন ছেনি দিয়ে খোদাই করা সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন। হাত-পা লম্বাটে ধরনের নয়। তাকে দেখলে তার প্রকৃত বয়সের অর্ধেক বলে মনে হবে। সে অসঙ্কোচে স্বীকার করে যে জীবনে সে যতগুলি স্ত্রী গ্রহণ করেছে তার সংখ্যা ভুলে গেছে, তবে বর্তমানে তার এগারোটি স্ত্রী আছে। তার স্ত্রীরা তাকে কতগুলি পুত্ররত্ন উপহার দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার সঠিক ধারণা নেই, তবে সংখ্যায় তারা যে অনেক তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ না করে আমি থাকতে পারছি না। একবার তার কারালে এসে গল্প করার সময় বছর বারো বয়সের এক কিশোরকে আমার খুব ভাল লাগে। আমি শিকারে বের হবার সময় সে আমার সঙ্গে যাবার বায়না করে, আমার কার্টিজের ব্যাগ, পাইপ-তামাকের থলি আরও টুকিটাকি জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে চায়। আমি সর্দারের কাছে জানতে চাই সে কার ছেলে। সর্দাব এক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে বলল যে ছেলেটির পিতৃ পরিচয় তার অজানা। তারপর সে ছেলেটির কাছে জানতে চাইল তার বাবা কে ?

ছেলেটি মৃদু হেসে চোখ পিটপিট করে বলল, 'আমার বাবা তো তুমি।'

সিংহ শিকারের উদ্দেশ্যে সেখানে আমার থাকার জন্য সর্দার

একটি কুটীরের ব্যবস্থা করে দিল। আমি ও আমার বন্দুক-বাহক সাহুকো যথারীতি সেখানে আস্তানা গাড়লাম। আমার রাঁধুনী ও তার ছেলে কাছাকাছি আর এক কুটীরে রইল।

সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পরে সর্দার ফেইরা আর একজন লোকের সঙ্গে আমার কুটীরে হাজির হলো। তারা আমায় জানাল যে স্ত্রীলোকটির কুটীরে এর আগে সিংহ হানা দিয়েছিল, সেই স্ত্রীলোকটি একটু আগে তার বাগানের মধ্যে সিংহের উপস্থিতি টের পেয়েছে। সর্দারের সঙ্গীটি ওই স্ত্রীলোকের কুটীরের কাছাকাছিই বাস করে। সে যখন তার কুটীরে শুয়েছিল তখন স্ত্রীলোকটি নিজের কুটীর থেকে চিৎকার করে তাকে জানিয়েছে যে সিংহটা আবার এসেছে। স্ত্রীলোকটি তার ঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেয়েছে যে সিংহ তার মাচার তলায় ঘোরাফেরা করছে। লোকটি চিৎকার করে স্ত্রীলোকটিকে চুপচাপ থাকতে বলে এবং তাকে অভয় দিয়ে আরও জানায় যে সিংহের উপস্থিতির কথা জানিয়ে এখুনি চুপিচুপি গিয়ে আমায় ডেকে আনছে।

লোকটির সাহস আছে বলতে হবে, কারণ ওই স্ত্রীলোকের কুটীরের কাছেই তার কুটীর। তার উপর এইসব কুটীরগুলির মধ্যে ওদের যাতায়াতের ফলে পায়ে-চলা পথ সৃষ্টি হয়েছে এবং সিংহটিও স্বভাবতঃ ওই পথ ব্যবহার করছে। কাজেই লোকটির সিংহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। যা হোক, লোকটি বরাত জোরে বেঁচে গেছে এবং সর্দারের কাছে সিংহের উপস্থিতির সংবাদ খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে দিয়েছে।

আমি তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে সিংহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। বলাবাহুল্য যে সর্দারও আমাদের সঙ্গী হলো। তার গ্রামের সকলের প্রতিই সর্দারের এক পিতৃসুলভ মনোভাব ছিল, সম্ভবতঃ তাদের সঙ্গে তার কোন না কোনভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

আমরা সেখানে পৌঁছে সিংহের কোন সন্ধান পেলাম না।

অথচ স্ত্রীলোকটির কুটীরের চারপাশে খোলা জায়গায় আমরা সিংহের টাটকা পায়ের ছাপ দেখলাম, কিন্তু সেই পায়ের ছাপ কোনদিকে অদৃশ্য হয়েছে রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা গেল না। আমার শিকারের আলোটির রশ্মি হচ্ছে তীক্ষ্ণভাবে সমাহৃত, তা দিয়ে সন্ধানের কাজ চলে না। দূরের কোন নির্দিষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট স্থানে এই আলো ফেলা যায়। হয়তো দিনেরবেলায় জানোয়ারটা কোনদিকে পালিয়েছে তা বোঝা সম্ভব হতো। কাজেই স্ত্রীলোকটিকে ভয় পেতে বারণ করলাম এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাচার উপর আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথা বোঝালাম। তাকে সাবধানও করে দিলাম যে সূর্য ওঠার বেশ খানিক পরে যেন সে মাচার থেকে নিচে নামে। তারপর লোকটিকেও তার কুটীরে পৌঁছে দিলাম। তার নিরাপদ আশ্রয় লাভের পর আমরা গ্রামে নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলাম।

বাকি রাতটুকুতে আর ভয়ের কিছু ঘটেনি। পরদিন ভোরে আমি ও সাতুকো সর্দারের সঙ্গে বের হয়ে পড়লাম সিংহটা কোনদিকে গেছে তার হদিশের সন্ধানে। আমি খুব বেশি আশা করিনি তার সন্ধান পাওয়া যাবে। দীর্ঘ শস্যক্ষেতের মধ্যে পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তাছাড়া সে ওই শস্যক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না। ক্ষেতের জমির পরে শুরু হয়েছে লম্বা ঘাসের ঘন বন, মহিষেরা এখনও সেই ঘাস নিঃশেষ করেনি।

পায়ে চলা পথের কিছু দূর পর্যন্ত আমরা তার পদচিহ্ন দেখতে পেলাম। সে ঘাস বনের দিকে পালিয়েছে। ওই পথ ক্ষেতের জমির কাছে এসে শেষ হয়েছে। আরও প্রায় শ খানেক গজ পর্যন্ত আমরা তার অস্পষ্ট পদচিহ্ন খুঁজে পেলাম, তারপরই আর কিছু নেই। মহিষ ভোজ্য ঘাসবন মানুষের কাঁধের সমান উঁচু, তার উপর আরও এক-দেড়ফুট উঁচু হচ্ছে বীজাধার।

ঘাসের বনের কিনারার কাছাকাছি আসতেই আমি কিছু সাদা ইগ্রেট পাখি দেখতে পেলাম। তারা একটু উপরে উড়েই আবার নিচে বনের মধ্যে নেমে পড়ছে। বুঝলাম ওখানে নিশ্চয়ই মোষের দল আছে। মোষের উপস্থিতির নির্ভুল লক্ষণ হচ্ছে এই পাখিরা, বিশেষ করে যখন তারা একটু করে ওড়ে আর নেমে পড়ে। মোষের দল ঘাস বনের মধ্যে দিয়ে চলাফেরার কালে ঘাসগুলি আন্দোলিত হলে যেসব কীট-পতঙ্গ বেরিয়ে পড়ে এই পাখিগুলি তাদের ধরে ধরে খায়। তাই পাখিগুলি মোষের দলের সঙ্গেই থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে তারা দিব্যি মোষের পিঠে চড়েই চলেছে। মোষেরাও তাদের কিছু বলে না, কারণ কাদা মাখামাখি করার ফলে তাদের দেহে যেসব কীট-উকুন ইত্যাদি জন্মায়, পাখিগুলি সেইগুলিকেও খেয়ে নেয়।

আমাদের কিছু মাংসের দরকার থাকায় এবং সর্দারকেও কিছু উপহার দেবার উদ্দেশ্যে ওই বরফের মতো সাদা পাখিগুলি সেখানে দেখা গিয়েছিল আমি সেদিকে গেলাম। ঘাসের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগুনো ছাড়া আর কোন অসুবিধা নেই। অন্য জন্তু শিকারের সময় শিকারীর চলাফেরার শব্দ সম্বন্ধে যতটা সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, মহিষ শিকারের সময় ততটা প্রয়োজন হয় না। কারণ মোষের দল নিজেরাই যথেষ্ট শব্দ করে, ঘাষ ছেঁড়ে, চলাফেরা করে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ে। কাজেই জঙ্গলের মধ্যে চলাফেরার স্বাভাবিক শব্দে তারা চট করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে না। অবশ্য কোন যান্ত্রিক শব্দের কথা আলাদা, যেমন জীপ গাড়ি নিয়ে বন্য পশুর সন্ধান করতে গেলে মোষের দলও গাড়ির শব্দে স্থান ত্যাগ করবে।

মোষের দল কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি গুলি করে দুটিকে বধ করলাম। বাকিরা তখন হুড়মুড় করে ঘন ঘাস বনের মাঝে চোখের আড়ালে চলে গেল। দলটা খুব বেশি বড় ছিল না, গোটা

পঞ্চাশ-ষাট জানোয়ার হবে। তুটি মোষেই আপাততঃ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে বলে আমি আর বাকিগুলকে নিয়ে মাথা ঘামাই না। তারপর আমরা কারালে ফি:র আসি।

সিংহের আর কোন খবর আমাদের কাছে না আসায় আমি সর্দারকে বললাম যে আমি আর সাতুতো কয়েকদিন ওই স্ত্রালোকটির কুটিরে গিয়ে থাকি, আর সে তার শিশুদের নিয়ে কারালে চলে আস্থক। নরখাদকটা যেখানে পর পর তু রাত্রি হানা দিয়েছে সেখানে সে আবার আসতে পারে। আমরা তুজনে পালা করে রাত্রি জাগব। আমার কথা মতো সর্দার ব্যবস্থা করে দিলে। কিন্তু আমাদের রাত জেগে প্রতীক্ষা করাটাই বৃথা হলো। সিংহের আবির্ভাব ঘটল না।

আমরা আরও তু'তিন দিন ওই কুটীরে কাটালাম। ইতিমধ্যে কোন মানুষ মারার খবর না আসায় অনুমান করলাম যে সিংহটি আহারের জন্য কোন জন্তু মেরেছে। অবশ্য এ কথাও ভুলি না যে তার থাবা না থাকায় সে বড় জন্তু বধ করতে পারবে না। মোষ ছাড়া এ অঞ্চলে শুধু কয়েক জাতের হরিণ পাওয়া যায়। মোষ সে মারতে পারবে না। খোঁড়া পা নিয়ে সব সময় হারণের সঙ্গে ছুটেও পারবে না। তাই শেষ পর্যন্ত সে আবার মানুষ মারার জন্যেই হন্যে হয়ে উঠবে।

আমি আমার বেস-ক্যাম্পে ফিরে এলাম, কারণ সেখানে আমার কিছু লোকজনকে রেখে গিয়েছিলাম। তাদের জন্যে একটা মোষ মারার এবং তারা কেমন আছে তা জানার দরকার হয়েছিল।

পরদিন আমি শিকারে বের হলাম। রবিনসন ক্রুসোর ফ্রাইডে-এর মতো আমার যে ছেলোট জুটেছিল, সে আমার অব্যবহৃত পুরনো রাইফেল নিয়ে ছোটখাট শিকারের জন্যে একটু এদিক-ওদিক ঘোরার অনুমতি চাইল। তাকে আমি বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন বিপদজনক জানোয়ার মারতে তাকে আমি কখনও

যেতে দিতাম না। অবশ্য সে প্রায়ই আমাদের আহারের জন্য বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে ছোট হরিণ মেরে আনত। এই ধরনের শিকার তাকে প্রচুর আনন্দ দিত, তাছাড়া তার পরিচিত মহলে এই নিয়ে গর্ব করার সুযোগও সে পেত। কিন্তু এক সাংঘাতিক নরখাদক যখন কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তার জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোয় আপত্তি জানালাম। সে আমায় আশ্বাস দিল যে গভীর জঙ্গলে না গিয়ে সে হ্রদের তীরে ছোট বনের মধ্যেই হাঁস বা হরিণ শিকার করবে।

লিফুম্বার পশ্চিম দিকে একখণ্ড সরু সমতল ভূমিতে সোপানি গাছের জঙ্গল আছে। এই জঙ্গলে বড় ঘাস জন্মায় না, অনেক খোলা-মেলা জায়গা আছে, যেখানে ছোট ঝোপ-ঝাড় আছে। আমি তাকে সেদিকেই যেতে বললাম। ওই ধরনের জঙ্গলে নরখাদকের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা শুধু কম কেন, একবারে নেই বললেও চলে।

ওর গন্তব্যস্থানের বিপরীত দিকে আমি যাই। আমাদের দরকার মতো মহিষ শিকার করে, সেগুলিকে আমি যেখানে ক্যানো রেখে ছিলাম সেখানে বয়ে আনার ব্যবস্থা করলাম। তারপর আমি ও সাহুতো ফেরার সংকল্প করি। ফেরার আগে লোকগুলিকে বলে যাই যে মৃত প্রাণীগুলিকে নিয়ে তারা আমার ক্যানো নোঙর করার স্থানে পৌঁছনোর আগেই আমি তাদের জন্য একটি বড় ক্যানো পাঠিয়ে দেব যাতে তারা স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে।

যথা সময়ে আমার হ্রদের পাড়ের সরু পায়ে চলা পথ ধরলাম। পথের কয়েক জায়গায় হঠাৎ আমরা নজরে এল কোন মানুষের ছোট পায়ের চিহ্ন। আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেই লোকটিও একটু আগে সেই দিকেই গেছে। আমার মনে কেমন এক অস্বস্তির ভাব জাগল। যদিও এই রকম অস্বস্তি বোধের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, তবু আমি দেখেছি কোন বিপদ ঘটার আগে আমার মন কেমন করে যেন তার আভাস পায়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে বিপদের সংকেত জানাচ্ছে সে বিপদ কার কাছ থেকে আসতে পারে? কোন বন্য

মহিষকে তো আমি আহত অবস্থায় ফেলে আসিনি যে ক্রোধে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবে? তবে কি নরখাদক সিংহটাই কাছাকাছি কোথাও আছে?

আমার ডান দিকে হ্রদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছোট ঘাসের বন। তারপরে খানিকটা উচ্চভূমি, ছোট ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা। আমার বাঁ দিকে পথের ধারেই জঙ্গলটা অগভীর হলেও ঝোপ-ঝাড় ও তাল গাছের সারির মাঝে চার-পাঁচ ফুট উঁচু ঘাস জন্মেছে। এই ঘাসের মধ্যে সিংহকে নজরে পড়ার সম্ভাবনা একবারেই নেই। অথচ সিংহ থাকলে ওখানেই থাকবে। আমার ডান দিকের ছোট ঘাসের জঙ্গলে থাকলে আমি তাকে দেখতে পেয়ে যেতাম।

রাইফেল রেডি করে নিয়ে আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। মাত্র কয়েক পা এগোতেই আমার সামনে পথের উপর আমি তার চিহ্ন দেখতে পেলাম। আমার বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে সে বেরিয়েছে। পথের উপর ধূলোর মত মিহি বালিতে তার পায়ের ছাপ রয়েছে। পায়ের চিহ্ন যে তারই সেটা সহজে বুঝতে পারলাম, কারণ সামনের এক পায়ের থাবার চিহ্ন পথে পড়েনি। একটু আগে আর একজন যে এই পথ দিয়ে গেছে তার পদচিহ্নের উপরে বা কখনও পাশে এই সিংহের পদচিহ্নগুলি রয়েছে।

আমার পক্ষে খুবই দুশ্চিন্তার কারণ ঘটল। সিংহটি কি সন্তর্পণে পথিককে অনুসরণ করছে? শুধু ঘটনাচক্রে লোকটি যাবার পরে সিংহ এই পথ ধরে গেছে? শেষের প্রশ্নটিতে আমার সন্দেহ জাগে। এই রকম জায়গায় এই রকম সময় সিংহের লোকটির পিছু নেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আমার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে যাতে ভয়ংকর কিছু ঘটার আগে লোকটিকে রক্ষা করতে পারি। হয়তো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। এখানে পৌঁছে ওই দুজনের পদচিহ্ন আবিষ্কারের আগেই সিংহ হয়ত হতভাগ্য পথিককে মেরে মুখে তুলে নিয়ে গেছে এবং পথের

কাছাকাছি কোন ঝোপের আড়ালে বসে নিশ্চিন্ত মনে তাকে খাচ্ছে।

হঠাৎ এক ভীষণ দুশ্চিন্তা আমার মাথায় বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। পথিক আমার ছোট ফ্রাইডে নয় তো? বয়স্ক মানুষের পায়ের চিহ্ন এগুলি নয়। বনের মধ্যে সে ছাড়া একা-একা আর কোন বালক ঘুরে বেড়াবে?

অবশ্য ফ্রাইডে তার এই ছোটখাট শিকারের সময় সমবয়সী দু-এক বন্ধুকে সঙ্গে নিত, নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে তাদের কাছে খানিকটা গর্ব করার জন্যে। কিন্তু আজ যখন আমি ক্যাম্প থেকে বের হই, সেখানে মাত্র দুটি কম বয়সী ছেলে ছিল—ফ্রাইডে আর তার এক বন্ধু। ফ্রাইডেকে আমি যতটা জানি, তাতে আরও বেশি চিন্তিত হলাম। সে আমায় ভালবাসে, আমার ছোটখাট সুখ-সুবিধার দিকে তার সব সময় নজর থাকে। সে নিশ্চয়ই তার বন্ধুকে সঙ্গে না টেনে ক্যাম্পেই থাকতে বলবে, যাতে আমি ও সাতুতো শিকার করে ক্যাম্পে প্রত্যাবর্তন করলে ক্লান্তি দূর করার জন্যে গরম চা বা কফি মুখের কাছে পাই। অনেকবার ও এই রকম ব্যবস্থা করে তবে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়েছে। আজ আমার মাথায় এই চিন্তা আসেনি যে সিংহ যখন আসপাশেই আছে তখন তাকে একা যে*তে বারণ করা দরকার।

আবার ভাবি ওই ছোট পদচিহ্নগুলি নিশ্চয়ই ফ্রাইডের নয়। বেশ কিছুক্ষণ আগে আমি একটা বন্দুকের শব্দ শুনেছিলাম, আর শব্দটা সেইদিক থেকেই এসেছিল, যেদিকে আমি তাকে হরিণ শিকারে যেতে বলেছিলাম।

যাহোক, সিংহের সম্ভাব্য শিকার ফ্রাইডে হোক বা না হোক, তাঁকে বাঁচানোর জন্য আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমি জানি আফ্রিকানরা শিকারে বেরিয়ে খুব কম পিছন ফিরে তাকায় এবং সে বিপদ সম্পর্কে তারা অবহিত নয়, তা নিয়ে মোটেই দুশ্চিন্তা করে

না। সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে তাদের স্বভাবজাত অনুভূতি বা ইনটুইশন খুব কমই আছে। বিপদের গন্ধ তারা পায় না, বিপদ এলে তখন তার মুখোমুখি হয়ে সাহস দেখাতে পারে। আমার সামনে বিপদের তীব্র অনুভূতি সত্ত্বেও পথের উপর সিংহের টাট্‌কা পায়ের ছাপ ধরে আমি যতদূর সম্ভব দ্রুতবেগে এগিয়ে চলি।

আমি দৌড়লাম না এই কারণে যে তাহলে হাঁপিয়ে পড়ব এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কিছু কবার সময় দ্রুত নিঃশ্বাসের ফলে বুকের ওঠানামার সঙ্গে হাত কেঁপে যেতে পারে।

সব পায়ে চলা পথের মতো এটিও আঁকাবাঁকা। তার ফলে পঁচিশ-ত্রিশ গজের বেশি সামনে কখনোই দেখতে পাই না। যাহোক, খানিকটা এগিয়ে এক ঝোপের বাঁক ঘুরতে সামনে হ্রদের কিছুটা চোখে পড়ল। প্রায় পঞ্চাশগজ পরিষ্কার একটানা নজরে পড়ল।

ওই পঞ্চাশ গজ পথের প্রায় মাঝামাঝি ফ্রাইডেকে দেখতে পেলাম। একটা ছোট ইম্প'লা হরিণ তার কাঁধে। হরিণের পাগুলির মাঝে রাইফেলটা বেঁধে নিয়েছে বয়ে নিয়ে যাবার সুবিধার জন্যে। হরিণের ভারে নুয়ে পড়ে সে আস্তে আস্তে চলেছে। তার ও আমার মাঝখানে আর একজনও খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। সে হচ্ছে ওই নরখাদক সিংহটি। সিংহের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিকারের একটু কাছাকাছি হয়ে বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করার।

তার একটি থাবা না থাকায় বহু সহজ শিকার যে তার মুখ থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে এই সত্য ইতিমধ্যে সিংহ হৃদয়ঙ্গম করেছে। লক্ষ্য করলাম এখনো সে খুঁড়িয়ে চলেছে।

আমার পক্ষে অবস্থাটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। গুলি ছুঁড়লে তার গতিপথের সরল রেখায় ফ্রাইডে রয়েছে, আর গুলি করলে আমি শুধু সিংহের পশ্চাৎদেশে করতে পারি, যা তার পক্ষে মারাত্মক না হবারই সম্ভাবনা। অথচ ক্রুদ্ধ সিংহ অবস্থাটা আরও জটিল করে তুলতে পারে।

আমি এক হাঁটু গেড়ে বসলাম এবং প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম। তাতেই কাজ হলো। সিংহ চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে তাকাল। তার চওড়া দেহ এবার আমার বন্দুকের নিশানার মধ্যে এল। ফ্রাইডেও দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনে চাইল। আমার রাইফেল গর্জে উঠল। সিংহের স্কন্ধদেশ ভেদ করে বুলেট খাওয়ায় যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নিঃশব্দে সে নিথর হয়ে গেল।

ফ্রাইডের মুখের ভাব কাটা তুলে রাখার মতো।

ফ্রাইডে কী ভাবে সিংহের কবলে পড়েছিল তা বলি :—

হরিণের পালের মধ্যে একটিকে লক্ষ্য করে গুলি সে করেছিলো। সেই হরিণের দেহ ভেদ করে বুলেট নিকটে দণ্ডায়মান আর একটি বাচ্চা হরিণকে আহত করে। প্রথম হরিণটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়, আর দ্বিতীয়টি দৌড়ে পালায়। বোঝা যায় যে সে ভালভাবেই আহত হয়েছে, না'হলে দলের সঙ্গে একই দিকে না দৌড়ে দলছেড়ে অন্যদিকে পালাতো না।

ফ্রাইডে আহত হরিণ শিশুকে অনুসরণ করল। তাকে বেশ খানিকটা দৌড়তে হয়েছিল। যখন তাকে খুঁজে পেল, তখন সে মারা গেছে। ক্যানোর থেকে অনেকটা দূরে চলে আসায় সে স্থির করল এটিতে বয়ে নিয়ে হ্রদের ঘাটের কাছে রেখে এসে প্রথম হরিণটা আর ক্যানোটা এখানে নিয়ে আসবে।

এক গুলিতে দুটি হরিণ মারার আনন্দে ও উত্তেজনায় সিংহের কথা সে একবারেই ভুলে গিয়েছিল। এই এলাকায় সিংহ তাকে একা পেয়ে মারার জন্যে যে পিছু নিতে পারে এই চিন্তা তার মাথায় তাই একেবারেই আসেনি।

মৃত সিংহের পদচিহ্ন পর্যবেক্ষণ করে তার ব্যাপারটাও সহজে বুঝলাম। পথের দশগজ দূরে এক ঝোপে সে শুয়েছিল। ফ্রাইডের বন্দুকের শব্দ সে শুনেছিল কিনা জানি না, তবে পথের উপর থেকে

এক অদ্ভুত গন্ধের সংমিশ্রণ—হরিণের, মানুষের, আর টাটকা রক্তের গন্ধ বাতাসে তার নাকে ভেসে এসেছিল। সে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথের যেখানে আসে সেখানটা ফ্রাইডে ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে। নইলে সিংহ তাকে সেখানেই বধ করত। যাহোক, তাকে ধরার জন্য সিংহ পিছু নেয়।

নরখাদকের স্বভাব হচ্ছে ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এই সিংহটিও আশা করছিল যে ফ্রাইডে যদি কোথাও একবার স্থির হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে এগিয়ে কোন ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভাগ্যিস ফ্রাইডে চলা বন্ধ করে দাঁড়ায় নি। আর ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে এখানে এসে পড়েছিলাম।

# রাতে টিম্বুকটুর পথে

## (The night we went to Timbuktu)

[ লেখক রিচার্ড ম্যাকমিলান আফ্রিকাব পশ্চিম উপকূলে যে বাংলোয় থাকতেন, সেখান থেকে টিম্বুকটু যাতায়াতে ঠিক তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এক ছুটিতে লেখক ও তাঁর স্ত্রী স্থির করলেন যে এই দূরত্বের খানিকটা যদি তাঁরা রাতে ভ্রমণ করেন, তাহলে তাঁরা নাইজার নদীর তীরে 'রহস্যময় লা ভিলে' ( ফরাসীদের বর্ণনা মত ), কিংবা 'সহস্র সাধুর শহর' ( স্থানীয় বাসিন্দাদের বর্ণনা মত ) দেখে ছুটির মেয়াদের মধ্যেই ফিরতে পারেন। তাঁদের ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হয় বটে, তবে পথে বিঘ্ন-বিপদও কম ঘটেনি। যাহোক, আফ্রিকার গভীরে তাঁদের অ্যাডভেঞ্চাব যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি মজাদার। ]

আমরা সাত দিনের ছুটি পেলাম। এর পুরো সদ্ব্যবহার না করলে আফশোষ হবে।

কোথায় যাওয়া যেতে পারে ?

'টিম্বুকটু গেলে কেমন হয় ?' কথাটা আমিই পাড়লাম।

'পাগলামি ক'রো না।' আমার স্ত্রী আপত্তি করল। 'আমরা আবিষ্কারক নই।'

আমি জানালাম, 'যাতায়াতে মাত্র তিন হাজার মাইল।

কথাটা বলে ম্যাপ খুলে বসলাম। স্ত্রী ম্যাপে চোখ ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'লাল দাগ দেওয়া ওখানটা কী ?'

আমি বলি, 'একমাত্র ওইটুকুই যা খারাপ—পথের শেষের ভাগটুকু। সাহারার মধ্যে দিয়ে বোরেম থেকে টিম্বুকটু পর্যন্ত দুশো মাইলের একটানা পথ।'

'মার্জিনে এটা কী লিখছে?' স্ত্রী লেখাটা পড়ল। 'খুব বর্ষার সময় পথটা অব্যবহার্য হয়ে পড়ে।'

আমি আশ্বাস দিয়ে বলি, 'বেশি বৃষ্টির দিন কেটে গেছে। এখন নভেম্বর—ভ্রমণের সবচেয়ে ভাল সময় এটা। রাস্তাঘাট এখন নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে।'

শেষ পর্যন্ত আমরা যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করলাম। দিনক্ষণও স্থির হলো।

নির্দিষ্ট দিনের সকালে—ভোর হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে—আমি স্ত্রীকে ঠেলে তুললাম। বিছানা থেকে লাফ মেরে নিচে দৌড়োলাম।

ড্রাইভার বেন আমাদের ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িটার কাছে অপেক্ষা করছিল আর আমাদের বাচ্চা চাকর আতিয়া বাড়ির রকের উপব সব মালপত্তর এনে জড় করে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই ঘন ঘন হাই তুলছিল। তাদের মুখে স্বাভাবিক মৃদু হাসি অনুপস্থিত, কারণ সাত-সকালে তাদের ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে।

আমরা গাড়িতে মালপত্তর বোঝাই করতে থাকি। আমাদের কাজের মাঝে আমার স্ত্রী এসে হাজির হলো এবং আমাদের কাজে একগাদা খুঁত বের করে ফেলল। ফলে আবার সব নতুন করে গোছাতে হলো।

আমার স্ত্রী একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে, 'যদি আমাকে পিছনে বসতে হয়, তাহলে এতটা পথ যাতে একটু হাত-পা ছড়িয়ে আরামে যেতে পারি সে ব্যবস্থা তো করা দরকার। আজকে কতদূর যাওয়ার আশা করছ?'

'বোলগাটাঙ্গা পর্যন্ত যাওয়া যাবে ব'লে মনে হয়।' আমি জবাব দিলাম।

'তার মানে উত্তরে একেবারে ফরাসী রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত।

'হ্যাঁ। প্রায় পাঁচশো মাইল।'

'অসম্ভব। দেশেই তুমি একদিনে পাঁচশো মাইল যেতে পারো না, আর এ তো অজানা অচেনা আফ্রিকা।'

'চেষ্টা করতে দোষ কী?'

তাকে আশ্বাস দিয়ে আমাদের আক্রার বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আফ্রিকার মধ্যে দি'য়ে মক্কা-তীর্থযাত্রীর দল যদি কেউ দেখে থাকে, তাহলে আমাদের এই যাত্রার কিছুটা ধারণা সে করতে পারবে। তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে নমাজ পড়ার জন্য যে মাদুর বা সতরঞ্চি থাকে তা আমাদের ছিল না বটে, তেমনি তার বদলে ছিল বীয়ার হুইস্কি ও সোডা। আমাদের মালপত্তর দেখলে মনে হবে বহুদূর দুর্গম দেশের যাত্রী। কী নেই আমাদের সঙ্গে? রান্নার বাসনপত্র, ডেকচি-প্যান, মগ, কেৎলি, এনামেলের প্লেট, কাঁটা-চামচে-ছুরি, টিন কাটার যন্ত্র, বোতলের ছিপি সোলার কর্ক-স্ক্রু, টিনে ষাঁড়ের মাংস, মুরগির মাংস, মাছ। আহারের সরঞ্জামের মতো শয্যার সরঞ্জামও আছে—মশারী, হাওয়া-ভরা তোষক, কম্বল। যন্ত্রপাতিও কিছু কম নয়, বাড়তি টায়ার-টিউব, জ্যাক, অয়েল ক্যান, স্টোভ, কোদাল-কুড়ুল (পথের জঙ্গল সাফ ও রান্নার কাঠ কাটার জন্য। খাদ্যাভাব হলে চাষ করতে লাঙল লাগবে—এই কথাটা স্ত্রীর সম্ভবত মাথায় না আসায় লাঙলটা আর নেওয়া হয়নি।) এর উপর ছিল আমাদের জামাকাপড় ও টুকিটাকি জিনিসের স্যুটকেসগুলি। এক বিরাট ফ্ল্যাস্কে বরফ ভরে নেওয়াও হয়েছিল। কারণ মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তো! এসব ছাড়াও ছিল পথের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যা—বিশ গ্যালন পেট্রোলে কানায় কানায় ভর্তি এক বড় ড্রাম।

ভোরের ঠাণ্ডা আবহাওয়া তখনও ছিল। ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন একটানা চলে। আমরা উত্তরে কুমাসি যাবার রাস্তা ধরলাম। চালক বেন-এর পাশে আমি আসন গ্রহণ করেছি।

যে পথ ধরে আমরা অগ্রসর হই, সেটি হচ্ছে পাঁচশো মাইল দীর্ঘ এক সুন্দর হাইওয়ে। পথটি গেছে তালবীথি ঘেরা উপকূল অঞ্চল থেকে পূর্বেকার নর্দান টেরিটরিজের আমলে, লেক অফ দি সেক্রেড ক্রোকোডাইলস-এ, তারপর সীমান্ত অঞ্চলের বাওয়াকু ও নির্জন বনভূমির ওপারে।

ইয়েজিতে হোয়াইট ভোল্টা নদীর খেয়া-পারের জন্য কুমাসির বাঁধের উপর আমরা উঠলাম। এই স্থানটি গ্রীষ্মমণ্ডলের বনাঞ্চল। আঁকাবাঁকা হাই-ওয়ের নিচে অবিস্মরণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল। ফ্রেঞ্চ আইভরি কোস্টের দিকে মাইলের পর মাইল ব্যাপী ঝোপঝাড় থেকে কুয়াশার কুণ্ডলী উঠছে। এখনও পর্যন্ত এ হচ্ছে বৃহৎ বন্যপশুদের বাসাঞ্চল।

কর্দমাক্ত জলের নদীতে পৌঁছে খেয়া পার হলাম। খেয়াঘাটের যাত্রীদলের মধ্যে আফ্রিকার বহু বৈচিত্রপূর্ণ জাতির পরিচয় পাওয়া যায়,—নাইজেরিয়া থেকে আসা ভবঘুরে ইয়োরোপ জাতির স্ত্রী-পুরুষ, পশারীরা, নাইজার উপত্যকার ফরাসী-ভাষী বলিষ্ঠ বাসিন্দারা অস্থায়ী কাজে যাচ্ছে বা কাজ সেরে ফিরছে; হাতির দাঁতের বহুবিধ অলংকার সহ হাউসা-মানুষরা, রঙীন ছাতা মাথায় দু'একজন ছোটখাট সর্দার, কিছু সিরীয় বণিক, আর সর্বত্র যাদের দেখা যায় সেই শ্বেত-পোষাকধারী মিশনারীরা।

হোয়াইট ভোল্টাকে পিছনে রেখে গাড়ির চাকায় গোলাপী-লাল ধূলি ঝড় তুলে আমরা এগিয়ে গিয়ে কাঁচা রাস্তা ছেড়ে বিশ লক্ষ-পাউণ্ড ব্যয়ে সদ্যনির্মিত দুশো মাইল দীর্ঘ টারম্যাকের রাস্তায় আবার পড়লাম। এখানে আমরা যাকে বলে রীতিমত বেগে গাড়ি চালাতে

সক্ষম হলাম। এখন আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তরে ফরাসী সীমান্তের রেড ভোল্টা।

দিনের আলো ফুরোবার আগে লেক অফ দি সেক্রেড ক্রোকোডাইলে পৌঁছোবার জন্য আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। আফ্রিকার নিরক্ষরেক্ষা অঞ্চলে সারা বছরই ছটার একটু পরে আর সন্ধ্যার আলো থাকে না। কাজেই আমরা আহারের জন্যে পর্যন্ত সময় নষ্ট করি না। তবু পৌঁছোতে বেশ দেরী হয়ে গেল। সরকারী রেস্ট-হাউসে রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। খোলা মাঠে বেন আমাদের খাবার জন্যে কিছু রান্না করে দিল। কিন্তু আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তার কষ্ট করে করা রান্নাব উপযুক্ত সদ্‌গতি না করেই মশারীর মধ্যে ঢুকে পড়ি। পরদিন খুব ভোবে উঠে পড়লাম 'সাধু কুমিরদের হ্রদের' কুমিরদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্যে!

এই হ্রদটা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি বাঁধ দেওয়া নদী। এ অঞ্চলের জলের প্রয়োজন এই হ্রদ মেটায়। কুমিররাও এটাকে তাদের নিরাপদ আশ্রয় রূপে পেয়েছে, কারণ স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করে যে এই সরীসৃপগুলির সঙ্গে মানুষের এক আত্মিক বন্ধন আছে। যদি কোন কুমিরকে মারা হয়, তাহলে কোন মানুষের প্রাণও তার সঙ্গে একত্রে পরলোকে গমন করবে।

এই হ্রদের কিছু কুমির এমন পোষ মেনে গেছে যে গ্রামবাসীরা তাদের দেহে কড়ির মালা, ধাতুর পাত ইত্যাদি গয়না আদর করে পরিয়ে দিয়েছে।

বোলগাটাঙ্গাতে আমরা যখন রাস্তা ছেড়ে এলিফ্যান্ট-ঘাসের বন পেরিয়ে হ্রদের পাড়ে পৌঁছোলাম, তখন মাটির দেওয়াল ঘেরা কাছের গ্রাম থেকে ভীষণ হল্লা উঠল। আমাদের আগমন যে তারা টের পেয়েছে সেটাই জানিয়ে দিল।

ধূলির ঝড় তুলে এক ডজন ন্যাংটো ছেলেমেয়ে খোলা মাঠ

পেরিয়ে স্থানীয় দাগবাণী ভাষায় চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। আমি তাদের ভাষার এক বর্ণও বুঝি না, কিন্তু আমাদের ড্রাইভার বেন কান্তি উপজাতির হলেও প্রায় যে কোন স্থানীয় ভাষায় কাজ চালাতে পারে। সে ওদের বক্তব্য অনুবাদ করে দেয়।

কুমিরের হ্রদের পাড়ে ছেলেমেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরে 'দাশ'-এর জন্যে চেঁচায়। পশ্চিম আফ্রিকার ভাষায় দাশ মানে বখশিস।

বেন বোঝাল, 'এরা বলছে হুজুর যদি ছ' পেনি বখশিস দেন, তাহলে এরা কুমিরদের ডাকবে, তাদের খাওয়া দেখাবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এরা ডাকলেই কুমিররা জল থেকে উঠে এদের কাছে আসবে?'

বেন জবাব দিল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'ঠিক আছে, আমি বখশিস দিতে রাজি।'

ছেলেদের দেখাবার জন্যে আমি পকেট থেকে একটি মুদ্রা বের করলাম।

তৎক্ষণাৎ তারা সমস্বরে মন্ত্রের মতো কী আওড়াতে শুরু করল, অনেকটা একদল বাঁদরের কিচির-মিচির করার মতন। প্রায় আধ মিনিট এটা চলল ক্রমবর্ধমান তালে। এই আবৃত্তির সময় ছেলেমেয়েরা একদৃষ্টিতে জলের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ একটি ছেলে চিৎকার করে জলে একটি বুদ্বুদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। আমি সেদিকে তাকালাম। প্রথমে লম্বা মুখটা, তারপর দুটি চোখ জলেব উপরি ভাগে ভেসে উঠল চোখ দুটি সতর্কভাবে চারদিক পর্যবেক্ষণ কবে। শেষে কুমিবটা পাড়ের দিকে সাঁতরে এসে আস্তে আস্তে ডাঙায় উঠল। তারপর একটি ছেলের দিকে এগিয়ে গেল। সেই ছেলেটি ইতিমধ্যে ঝোপ খুঁজে একটা ব্যাঙ ধরেছে। ব্যাঙের পা ধরে সে শূন্যে সেটিকে নাচাচ্ছিল।

কুমির ছেলেটার কাছে যেতে যেতে একবার হাঁ করে, আবার

মুখ বন্ধ করে। বার কয়েক খুব দ্রুত এটা করে। ছেলেটার কাছ থেকে কয়েক ফুট মাত্র দূরে এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার মাথাটা উঁচু হলো, মুখটা হাঁ হয়েই রইল মুখরোচক ওই খাদ্যের প্রতীক্ষায়। এক মুহূর্ত তার মুখের সামনে ব্যাঙটা নাড়িয়ে ছেলেটি তার মুখের মধ্যে সেটি ফেলে দিল।

একটি, দুটি, তিনটি করে আরও ব্যাঙ ছেলেরা খুঁজে আনলে এবং ওই ভাবে কুমিরটাকে খাওয়াল। তারপর একটি সাহসী ছেলে এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে কুমিরের লেজটা ধরল। আমার ফটো তুলতে যতক্ষণ লাগল, ততক্ষণ সে লেজ ধরে রইল।

আমি বললাম, 'বেন, ওদের বলো আর নয়। এবার আমাদের যেতে হবে। সীমান্তে পৌঁছাতে হলে এখনও পঞ্চাশ মাইল রাস্তা বাকি।'

গাড়িতে উঠে স্থান ত্যাগ করার আগে আমি লক্ষ্য করলাম বালির উপর আধ ডজন কুমির এসে খাবার লোভে লাইন লাগিয়েছে।

আমরা এবার সুন্দর পিচের রাস্তা ছেড়ে বাওকুতে সীমান্ত পার হবার জন্যে সোয়ার রাস্তা ধরালাম। থানার পুলিসকে আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে দেশ ত্যাগ করার যথারীতি নোটিশ দিয়ে অগ্রসর হলাম। তারপর সীমান্ত পার হয়ে অজানা জনহীন দেশের দিকে গাড়ি জমালাম।

পাহাড়ী গর্দভের লেজের মতো সরু রাস্তা ধরে কয়েক মাইল গিয়ে আমরা প্রায় শুকিয়ে যাওয়া রেড ভোল্ট নদীগর্ভে পৌঁছোলাম। গাড়ি চালিয়ে বিশেষ কষ্ট না করেই আমরা পার হয়ে গেলাম। নদীর অপর পার বেশ খাড়া ও প্রস্তর সংকুল। মনে হল আমরা যেন পাহাড়ে উঠছি। যা হোক, আমরা এটাও পার হলাম।

তারপর সত্যিই খারাপ রাস্তা শুরু হলো। এমন খারাপ রাস্তা

এর আগে কখনো আমি দেখিনি। মাইলের পর মাইল উঁচু-নিচু পাথরের মধ্যে দিয়ে পথটা গেছে। বৃষ্টি ধারায় সৃষ্টি ছোট ছোট নালা পথে পড়ল। জংলি ঘাস আর জলাভাবে মরে যাওয়া গাছের গুঁড়িও মাঝে মাঝে পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারপর আবার আমরা পাহাড়ী পথ পেলাম। পাথরের জন্য গাড়ির টায়ার সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো। কিন্তু বরাত ভাল বলতে হবে, টায়ার ফাটে না। শক্ত করে স্টিয়ারিং চেপে ধরতে হয় আমায়। গাড়িতে এত বেশি ঝাঁকুনি লাগে যে জাহাজের ঝাঁকুনিতে যাত্রীদের যেমন 'সি-সিকনেস' হয়, আমাদেরও তেমনি প্রায় 'ল্যাণ্ড-সিকনেস' হল।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। মরু বালুকার তপ্ত হাওয়ার ঝলক তীরের মত আমাদের বিদ্ধ করে, চোখ মুখ জ্বালা করে, ঠোঁট গলা শুকিয়ে ওঠে। পাহাড়ী অন্তরীপ পিছনে ফেলে আমরা ধূলি ভরা রাস্তায় পেঁৗছোলাম। রাস্তাটি লম্বা ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে। এই বনের ঘাসগুলি জলাভাবে বিবর্ণ সাদা। সবুজের লেশ কোথাও নেই।

মাইল দুয়েক যাওয়ার পর আমরা এক বৃহৎ বেবুন পরিবারের সাক্ষাৎ পেলাম। ভয়ংকর গোলমাল তারা করছে। বেশ জোর লড়াই চলেছে দেখলাম। নিঃসঙ্গ একজন সাবা দলের আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।

লড়াইয়ের ফলাফল দেখার জন্যে আমরা গাড়ি থামালাম। কিন্তু সমস্ত দলটা চিৎকার আর মারামারি করতে করতে শৈলশিলার ওপারে চলে গেল।

যখন আমরা ফরাসী সীমান্ত-ঘাঁটিতে পেঁৗছোই, তখন পথের জঙ্গলে বেবুনদলের মারামারি কথা তুলতে জানতে পারলাম যে এই লড়াই বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে। আমরা আরও জানালাম যে এই লড়াই হচ্ছে দলের নেতৃত্ব নিয়ে। একজন দলের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য লড়ছে, আর অন্যেরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে,

সম্ভবতঃ বার্ধক্য বা অসুস্থতার জন্যে তার নেতৃত্ব অন্যদের পছন্দ নয়।

সীমান্তে আইনকানুনের যেসব করণীয় ব্যাপার আছে সেগুলি দ্রুত সেরে নিয়ে আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

রাত্রি নামার আগে নাইজারে পৌঁছোনো এখন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ আমরা শুনেছি দিনের শেষেই শেষ খেয়া। রাতে পারাপার বন্ধ থাকে। আমরা কোন বড় রাস্তা খুঁজে পাই না, অথচ ম্যাপ অনুযায়ী আমরা বুঝি যে ফ্রেঞ্চ আইভরি কোস্টের রাজধানী আবিদ্জান ও নিয়ামেকে সংযোগকারী প্রধান সড়কের কাছাকাছি আমরা পৌঁছেছি।

আরও কয়েক মাইল উঁচু-নিচু রাস্তা ভাঙার পরে আমরা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নিয়ামে যাবার বড় রাস্তায় পড়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। যদিও রাস্তাটি সম্বন্ধে গর্ব করার মতো কিছু নেই, কয়েক গজ অন্তরই খানা গর্ত, তবু সীমান্ত থেকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তায় আমরা এতক্ষণ আসছিলাম, তার চেয়ে ভাল।

দুপুরের বেশ কিছু পরে খাবার জন্যে আমরা থামলাম। মাংসের একটা টিন খোলা হলো। একটা টিনের মগে মাংসটা যখন ঢালা হলো, তখন আমার স্ত্রী মন্তব্য করল যে গরমে সেটা গলে পাঁক হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু সেই পাঁক অবলীলাক্রমে গলাধঃকরণ করলাম, কারণ আমরা তখন ক্ষুধার্ত। কিছু রুটিও আমাদের ছিল, সেগুলি একবারে বিস্বাদ তখনও হয়নি, তাছাড়া ঈষদুষ্ণ বীয়ারের বোতলও ছিল।

আমাদের দ্রুত আহার পর্বের মাঝখানে হঠাৎ রাস্তার পাশের এক ঝোপ ফাঁক করে একটি ছেলের আবির্ভাব ঘটল। সে একটা লম্বা লাঠির ডগায় একটি কুমির ছানা বেঁধে এনেছে। বেন আমাদের বোঝাল যে ছেলেটি জানতে চাইছে খাবার জন্যে আমার এই কুমির ছানাটা কিনব কিনা। এই রকম ভোজ্যবস্তুতে যে আমাদের আগ্রহ

নেই সেটা আমরা তাকে বোঝালাম। ছেলেটি একটু হয়তো অবাক হয়েই চলে গেল, কারণ এই রকম লোভনীয় খাদ্যের লোভ সামলে সে আমাদের বেচতে এসেছিল। যা হোক, আমরা না কেনায় তার এক পক্ষে লাভই হলো, সে মহানন্দে এটিকে আহার করতে পারবে।

আমাদের এখনও দুশো মাইলের উপর পথ অতিক্রম করতে হবে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা দৌড়োই।

আমি ঘোষণা করলাম, 'এরপর আমরা নাইজারে থামব।' গাড়িটা আমিই চালাই এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা চালাই। বন সীমার আড়ালে সূর্য পাটে নামে। আমরা এক বাঁধের উপর পৌঁছোলাম। দূরে এক উপত্যকা দেখতে পেলাম, উপকূল অঞ্চল ছাড়ার পর এমন হরিৎবর্ণের উপত্যকা আর দৃষ্টি পথে পড়েনি। আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা বিখ্যাত বৃহৎ নদী নাইজারের কাছে এসে পৌঁছেছি।

সূর্য একবারে ডুবে যাওয়ার আগে আমরা দেখতে পেলাম মনোমুগ্ধকর নাইজারকে। প্রশস্ত, শান্ত, বিদায়গামী সূর্যের শেষ রশ্মিরাশি তার বুকে প্রতিবিম্বিত। দুই তীরের সবুজ বৃক্ষরাশির মাঝ দিয়ে সুদীর্ঘ এই নদী ছুটে চলেছে অজানার সন্ধানে। এই মুহূর্তে আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম কেন দুঃসাহসী আবিষ্কারকদের মন এই রহস্যময়ী বেগবতীকে প্রথম দর্শনে আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠল? এর উৎস ও গতিপথ নিয়ে যুগে যুগে মানুষ কতই না জল্পনা-কল্পনা করেছে।

নাইজার উপত্যকায় চোখের নিমেষে রাত্রি নেমে এল। এক মুহূর্ত আগে ছিল গোধূলির আলো, তারপরেই অন্ধকারের যবনিকা নেমে এল। দৃষ্টিপথ হতে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে গেল।

আমরা যখন নদীর পাড়ে এসে পৌঁছোলাম, তখন বিপরীত পাড়ে নিয়ামে শহরের আলোগুলি দেখে মনে হলো চারধারে অন্ধকারের

মধ্যে যেন এক রূপকথার রাজপুরী—নির্জন নীরব ঘুমের দেশে প্রাণের প্রতীক ওই দীপাবলী।

গাড়ি থেকে নেমে অন্ধকার পাড় ধরে আমরা সাবধানে অগ্রসর হলাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে আমরা দেখলাম নদীর বুকে এক ভাসমান আলো, কোন এক জলযান চলেছে।

এইসময় জেলে-ডিঙি জাতীয় এক নৌকা আমাদের কাছে এসে তীরে ভিড়ল এবং লগি হাতে এক ছায়ামূর্তি তার থেকে নামল। ছায়ামূর্তি কাছে এগিয়ে আসতে দেখলাম যে মুসলমানদের প্রথানুযায়ী সাদা-পোষাক ও টুপি পরিহিত একজন।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নদীর বুকে ওটা কী নৌকা যাচ্ছে ?'

সে জবাব দিল, 'ওটাই তো খেয়া-নৌকা।'

—'শেষ খেয়া ?'

—'আজকের মত। কাল সকাল সাতটায় আবার খেয়া পাওয়া যাবে। কিন্তু আপনাদের চিন্তার কিছু নেই। আমি আপনাদের ওপারে নিয়ে যাব।

আমি তখনই বুঝলাম লোকটি আমাদের ভালোভাবে দোহন করতে চায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে কত দিতে হবে। সে বেশ মোটা টাকা চাইল। তার সঙ্গে দর কষাকষি করলে টাকার অঙ্ক কমানো যেত, কিন্তু আমি তখন এত ক্লান্ত যে কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছা করল না। তাই তার দাবী মেনে নিলাম।

বেনকে গাড়িতেই ঘুমাতে বলে এবং তার প্রয়োজন মেটাতে বেশ কিছু খাদ্য ও অর্থ দিয়ে আমি ও আমার স্ত্রী ডিঙিতে উঠলাম।

মাঝনদীর দিকে আমরা এগিয়ে চললাম। পাড় থেকে আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র স্রোত। আমাদের ভারে ছোট ডিঙি জলে ডুবু-ডুবু অবস্থায় ভেসে চলে এবং মাঝির

লগির প্রতিটি ধাক্কায় ডিঙিটা পাগলের মতো নেচে ওঠে, আর জলের ঢেউও সেই মাতামাতিতে যোগ দিতে চায়।

জলে ছোট ছোট বুদ্বুদ লক্ষ্য করে আমার স্ত্রী শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কুমির আছে?'

মাঝি লগি ঠেলা মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করল।

—'কুমির? সারা নদী কুমিরে ভর্তি। আর তারা বেশ বড় মাপের।'

সে মনে করে ব্যাপারটা খুবই মজার, তাই মন খুলে হেসেও উঠল। তারপর লগি দিয়ে এমন সজোরে ধাক্কা দিল যাতে মনে হলো আরোহীদের দেহভারে ভরা ছোট ডিঙি এবার ভরাডুবি হয়ে বিপদে ফেলবে।

নিয়ামের একতলা ছোট হোটেলটি তালকুঞ্জের মাঝে অবস্থিত। স্থানটি বেশ শীতল। হোটেল কিন্তু রীতিমত সরগরম। প্রাঙ্গণের বালিজমির উপর বার ও রেস্তোরাঁ, বাতির মালায় সজ্জিত; লাউঞ্জ ও কফি-রুমে বিচিত্র মানুষের ভিড়। ইভনিং-ড্রেসপরা মহিলাদের সঙ্গে আছে মেস-ড্রেসপরা অফিসাররা, স্বল্প বেশবাস পরিহিত তরুণীরা শার্ট-প্যান্টপরা তরুণ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে প্রণয়লীলায় মগ্ন, শ্মশ্রুমণ্ডিত রুক্ষ চেহারার উপনিবেশকারীও এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মানবজাতির এই মিশ্রণকে সম্পূর্ণ করার জন্যেই যেন কিছু আফ্রিকান যুবক ইউরোপীয় চালচলন নকল করে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে, মুহুর্মুহুঃ সিগারেট টানছে আর মার্বেল পাথরের কাউণ্টারের সামনে টুলে-বসা দু'তিনজন সঙ্গীহীন মহিলাকে আকারে-ইঙ্গিতে উত্যক্ত করছে।

ভ্রমণজনিত ক্লান্তির জন্যে হোটেলের এই সামাজিক হৈ-হৈ আমাদের কোন আকর্ষণ করে না। আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার কথা ভাবলাম।

আমার ঘুম খুব গভীর হয়েছিল, কিন্তু স্ত্রী জোয়ান গা-গতরে ব্যথার জন্যে ভাল করে ঘুমোতে পারে না। পরদিন ভোরে সে জানাল যে গাড়ির ধকল সে আর সইতে পারবে না। আমি তাকে যতদূর পারি ভরসা দিয়ে বললাম যে নাইজারের ধার দিয়ে এই পথ অতটা খারাপ হবে বলে মনে হয় না।

প্রাতরাশ সেরে আমরা খেয়াঘাটে গেলাম। খেয়া ইতিমধ্যে ওপারে চলে গেছে। মিনিট পনেরো বাদে ফিরতি খেয়ায় বেন ও আমাদের ল্যাণ্ড-রোভার এপারে এসে পৌঁছোল।

আমাদের পেট্রোল কম ছিল বলে ট্যাঙ্ক ও বাড়তি টিনগুলি আমি এখানে ভরে নিলাম। পেট্রোলের দাম যা চাইল তাতে চমকে উঠলাম। সীমান্তের ওপারে যা দাম তার দ্বিগুণেরও বেশি। আমাদের জিনিসপত্তর বেশির ভাগই জিপে থাকার ফলে গাড়ি বোঝাই করতে এখন আর বেশি দেরী হলো না।

মরুভূমির ধারের বাঁধের উপর দিয়ে পথ। পথের ডান দিকে মরুর উচ্চ মালভূমি দিগন্তে বিলীন হয়ে গেছে। যতদূর দৃষ্টি যায় সীমাহীন তপ্ত বালুরাশি, আগাছা আর কাঁটাঝোপ।

আমাদের বাঁ দিকে নিচে নদী বয়ে চলেছে, বালিয়াড়ির উপরে ওঠা অগ্নিগোলকের মত সূর্যের কিরণে নদীর প্রবহমান জলরাশি চিক্‌চিক করছে। মেঘহীন আকাশের চেয়ে নীল নদীর জল। কয়েক শো গজ চওড়া নাইজারকে আমরা দেখলাম দূরে প্রায় পৌনে এক মাইল বিস্তার লাভ করেছে।

বাঁধের নস্যি রংয়ের ধুলি আর মালভূমির একঘেঁয়ে ধূসর রংয়ের ঠিক বিপরীত হচ্ছে নদীর ধারে প্রচুর ঝোপ জঙ্গলে সবুজ বর্ণের সমারোহ। জনবসতির চিহ্ন নেই, যদিও নদীর কিনারার ঘন জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে আমরা ধোঁয়া উঠতে দেখি। মনে হয় গ্রাম না হলেও নির্জন কুটীর দু'একটি ওখানে আছে।

সকালের দিকে বেশ ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় আমরা পথ চলি, কিন্তু বেলা

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানটাকে মনে হয় একবারে 'তপ্ত-কড়াই'। তখন নদীর দিকে তাকালে মনে হয় তার শীতল জল যেন আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে।

নদীর বুকে নানা ধরনের জলযান দেখা যায়। বেশির ভাগই ডিঙি জাতীয়, পাকা হাতের দাঁড় বা লগির দ্বারা চালিত হচ্ছে। কিছু ডিঙি জ্বালানী কাঠ বোঝাই, কতকগুলিতে আছে চাল, চিনি আর লবনের বস্তা, আবার কিছুতে আছে পেট্রোলের ড্রাম। ডিঙির মালিকেরা ব্যবসায়ী তা বেশ বোঝা যায়, জলপথে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মাল নিয়ে যাওয়া স্থলপথের চেয়ে সস্তা পড়ে, কারণ দেশের অভ্যন্তরে পেট্রোলের দাম খুব চড়া।

বেশ কিছু ডিঙি স্ত্রীলোক ও বালিকারা বেয়ে নিয়ে চলেছে দেখলাম। একটা ডিঙি খুব অল্পবয়সী ছেলে বাইছিল, কিন্তু তার দাঁড় টানা দেখে মনে হলো এ কাজে সে বেশ ওস্তাদ। আমাদের দেখতে পেয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে। তার ডিঙি টলমল করে সাংঘাতিকভাবে, কিন্তু সে ঠিক টাল সামলে নদীতে ভেসে চলে। নদীর অপর ধারে এক খাঁড়ির মধ্যে আমরা কয়েকটা গণ্ডার দেখতে পেলাম, তাদের মধ্যে দুটো আবার একেবারে বাচ্চা। ডিঙিগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তারা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

পথের ধারে উজ্জ্বল বর্ণের বহু নাম-না জানা পাখি দেখতে পাই। তারা আমাদের গাড়ি দেখে ভয়ে ডাকতে ডাকতে শূন্যে তপ্ত হাওয়ায় উড়ে যায়।

আবহাওয়া এমন গরম হয়ে উঠে যা আমাদের ধারণার বাইরে। গাড়ির রেডিয়েটারের জল সোঁ সোঁ করতে থাকে আর গাড়ির ভেতরটা মনে হয় যেন বয়লার রুম। আমরা নাইজারের পাড়ে যাবার এক পথ ধরে বাঁধ থেকে নিচে নামলাম। ঠাণ্ডা জল পান করার এবং হাত-মুখের ধুলো-ঘাম ধুয়ে ফেলার জন্যে সেখানে একটু নামলাম।

জোয়ান জিজ্ঞাসা করল, 'গাও এখন আর কত দূরে ?'

'আমার মনে হয় প্রায় দুশো মাইল। সেখানে আর একটা ভাল হোটেল আছে। সাহারা পারাপারের যাত্রীরা প্রধানতঃ সেটা ব্যবহার করে। সেটাই হচ্ছে বর্তমান সভ্যতার শেষ চিহ্ন, তারপরই আদিম অকৃত্রিম মরুভূমি।'

—'গাও-এর পর আমরা কোথা যাব ?'

—'গাও থেকে বোরেম হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল। তারপর আমাদের ভ্রমণের শেষ অংশটুকু—প্রায় দুশো মাইল।'

আমরা যখন আবার যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ এক বাচ্চা ছেলে এসে আমাদের সামনে উপস্থিত হল। আমি জানি না বাচ্চারা কী করে যেন আমাদের আগমন টের পায় এবং এসে হাজির হয়। ছেলেটি আমাদের কাছে কিছু ডিম বিক্রি করতে চায়। সে যে কোত্থেকে এল, কী করে জানল আমরা এখানে আর সে যাবেই বা কোথায় তা আমাদের অনুমানের অসাধ্য। যুদ্ধের সময় পশ্চিম মরুভূমিতে আরব যাযাবরদের কথা আমার মনে পড়ল। রিক্ত নির্জন স্থানে নীল আকাশের নিচে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে এক আরব সামনে এসে দাঁড়াত আর বলত, 'ডিম, চাই ডিম ?' কয়েক মাইলের মধ্যে যখন কোন প্রাণীর চিহ্ন দেখতে পাইনি, তখন তার এই আকস্মিক আবির্ভাব ভোজবাজি বলে মনে হতো।

এই বালকটিকে দেখে আমার ধারণা হলো যে সে যেন নাইজারেরই মূর্ত প্রতীক, যে নাইজার এখানে নিগ্রো ও আরব আফ্রিকার মধ্যবর্তী রেখা রূপে রয়েছে। আমাদের যাত্রাপথে স্থানীয় লোকদের মধ্যে আমরা শুধু আফ্রিকানদের এতক্ষণ দেখেছি, এবার এই ছেলেটির বর্ণসংকর, তার বংশধারার মধ্যে আরব রক্তেরই প্রাধান্য।

সে কোথায় থাকে আমরা জানার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে আমাদের কথা বুঝতে না পেরে ডিমগুলি হাতবাড়িয়ে ধরে নীরবে

দাঁড়িয়ে রইল। ডিমগুলি আমরা কিনলাম। গাও থেকে একশো মাইল দূরে এক জায়গায় আমরা থেমেছিলাম রান্নার জন্যে, তখন ওই ডিমগুলি আমাদের কাজে লাগে।

আমরা যখন গাওয়ে পৌঁছোলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একটি ধূলিধূসর মাটির কুটিরের গ্রাম, বালিভরা পথ সাহারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্রামের পিছনেই মরুর সীমানা শুরু। বেশির ভাগ গৃহে ও স্থাপত্যে আরব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাসিন্দারের মধ্যে নিগ্রো ও আরব দুই জাতিরই সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

দোকানগুলি অনেকটা মধ্য প্রাচ্যের বাজার ও গুদামের মতন। ফেরিওয়ালারাও আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, তাদের কাছে জুতোর ফিতে থেকে হাতির দাঁতে তৈরি উট-হাতি ইত্যাদি খেলনা পাওয়া যায়।

আমরা পেট্রোল ট্যাংক ভরে নিই। মেরামতের জন্য প্যাংচার টায়ার সেখানের পেট্রোল-পাম্পে রেখে হোটেলের পথ ধরলাম।

হোটেলের ম্যানেজার ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মিল আছে আবিষ্কার করলাম। যুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ বাহিনীতে মেজর ছিলেন। মরু-যুদ্ধে তিনি এক যানবাহন-দলের দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে আমি মণ্টাগোমারির যুদ্ধের সংবাদদাতা ছিলাম এবং দু বছর লিবিয়ায় কাটিয়েছি। সোলাম, তোব্রুক, বেনগাজি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় আছে।

আমি তাঁর কাছে টিম্বুকটুর পথ সম্পর্কে খোঁজ করলাম। তিনি জানালেন পথ মোটেই ভাল নয়।

আমরা আবার এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে চাই শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের আহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত তাড়াহুড়ো কেন?'

আমি দেখে নিলাম আমার স্ত্রী যেন আমাদের কথা শুনতে না পায়। সে কাছাকাছি না থাকায় তাঁকে জানালাম স্টিমার ধরে

ফেরার জন্যে টিম্বুকটুতে সময় মত পৌঁছোতে চাইছি। তাহলে আর আমাদের দু'বার করে মরুভূমি পার হতে হয় না।'

হোটেল ম্যানেজার জানালেন 'টিম্বুকটুতে স্টিমারের তো কাল আসার কথা। কিন্তু আপনারা রাত্রে ভ্রমণ না করলে কিছুতেই সময়ে পৌঁছাতে পারবেন না। আর ভাল পথ প্রদর্শক না থাকলে রাত্রে ভ্রমণ রীতিমত বিপজ্জনক।"

স্ত্রীকে আসতে দেখে আমি চাপাস্বরে বললাম, 'বরাত ঠুকে বেরিয়ে তো পড়ি। তারপর কী হয় দেখা যাবে।'

বোরেম পর্যন্ত পথ বেশ ভালই এগোলাম। চাঁদের আলোয় রাস্তা সাদা হয়ে থাকায় কোন অসুবিধা হলো না। নির্মম সূর্য আকাশ থেকে বিদায় নেওয়ায় রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি। গাড়ি গর্জন করে দৌড়োতে থাকে, আমার মনে হয় হেড-লাইট যেন ম্লান হয়ে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠে আবার ঠিক হয়ে যায়। রাত দশটার কিছু আগে পরবর্তী বিরতি স্থানে পৌঁছবার সময় পর্যন্ত কোন গণ্ডগোল হয় না।

দূরের দিকে চেয়ে জোয়ান মন্তব্য করল, 'মরুর মধ্যে ওটাকে যেন দুর্গের মতো দেখাচ্ছে!'

বোরেমকে বাস্তবিক এক মরু-দুর্গের মত .দখতে। নীল আকাশের পটভূমিকায় এক বৃহৎ সুরক্ষিত মাটির গড়, যার মধ্যে আছে ছোট ছোট কুটির। রাস্তাগুলি গাওয়ের চেয়ে বেশি বালুকাময়। প্রধান রাস্তা বলে যেটিকে মনে হয়, সেটি ধরে আমরা এগিয়ে চলি যতক্ষণ না একটা ব্যারাকের মতো বাড়ি দেখতে পেলাম। আমি অনুমান করলাম সেটাই হচ্ছে রেস্ট-হাউস।

অন্ধকারে এক ছায়ামূর্তি দেখতে পেয়ে তার কাছে পথের নির্দেশ চাইলাম। লোকটি আরব, ফরাসী সৈন্যদলভুক্ত। সে জানাল যে সেও রেস্ট-হাউসে যাচ্ছে।

চওড়া দরজা দিয়ে রেস্ট-হাউসের ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম

সৈন্যদলের যানবাহনে প্রাঙ্গন বোঝাই, যার মধ্যে মরুভূমিতে গমনাগমনের উপযোগী ক্যাটারপিলার যানই বেশি। গাড়ির মধ্যে ড্রাইভারদের কুঁকড়ে শুয়ে থাকা দেহ অস্পষ্ট দেখা যায়। সঙ্গী আরবটি জানাল যে ওরা সকালে সাহারা পাড়ি দেবে সৈন্যদলের কোন এক ঘাঁটিতে মালপত্র সরবরাহের জন্যে।

স্থানটির তত্ত্বাবধায়ককে খুঁজে বের করলাম। তাকে দু'শিলিংয়ের মতো মুদ্রা দিতে অন্ধকার গলিপথ দিয়ে আমাদের নিয়ে হাজির হলো এক সারি ঘরের সামনে। প্রতি ঘরে একটি করে শয্যা থাকায় অনুমান করলাম এগুলি হচ্ছে গেস্ট-রুম। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাবার পথ, কিন্তু ঘরগুলির মাঝে কোন দরজা নেই এবং লোকেরা দিব্যি অবাধে অন্যের ঘরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছে।

তত্ত্বাবধায়ক জানাল, 'বাইরে রান্নাঘর একটা আছে। আপনারা গরম কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে আমি আগুনের জন্য কাঠের ব্যবস্থা করে দেব।'

তাকে বললাম যে আমরা এত ক্লান্ত যে খাওয়ার হাঙ্গামা আর করতে পারছি না, কোন রকমে শুয়ে পড়তে চাই। ঘরটি স্টেশনের ওয়েটিং-রুমের মতো হয়ে দাঁড়ায়, সারারাত্রি লোকের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। তাসত্ত্বেও ক্লান্তির জন্য আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

চমকে উঠে ঘুম ভাঙল। আর এক দল এসে পৌঁচেছে। মোটরের গর্জন, লোকজনের চেঁচানি, সৈন্যদের জুতোর মচমচানি, শিস্ দিয়ে গান সকলকেই জাগিয়ে দিল।

কক্ষের অন্ধকারে বিছানায় উঠে বসে সদ্য ঘুমভাঙা স্ত্রীকে আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে আজ রাতে আর ঘুমানো যাবে না।'

বাইরে উঠানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আলো আর আগুনের রাজত্ব সেখানে শুরু হয়েছে। আগুনে ক্ষুধার্ত সৈন্যদের রান্না চেপেছে।

গোলমাল চরমে ওঠে যখন একদল সৈন্য আগুনের কাছে বসে অশ্লীল গান গেয়ে হৈ-হৈ শুরু করে।

'এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই রাতেই বেরিয়ে পড়া। সকাল পর্যন্ত এখান এভাবে জেগে বসে থেকে কী লাভ!' আমি মন্তব্য করলাম।

আমার প্রস্তাবে স্ত্রী রাজি হলো। আমরা বেনকে ডেকে তুললাম। এই রেস্ট-হাউসে সম্ভবত সেই একমাত্র ব্যক্তি, যে ওই গণ্ডগোলের মধ্যেও কঠিন ভূমিশয্যায় পরম আরামে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

উঠানের গণ্ডগোল আর লোকজনের ঘোরাফেরা পিছনে ফেলে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমার মনে হলো গাড়ির হেডলাইট আবার কেঁপে উঠল, ইঞ্জিন কিন্তু ভালভাবেই চলে। আমি ভাবলাম ওটা বোধহয় আমার চোখের ভুল।

আকাশ উজ্জ্বল তারায় ভরা। সঙ্গে কম্পাস না থাকায় ওই তারা দেখেই আমি দিক্‌নির্ণয় করি। বুঝলাম যে যদি আমরা ডান দিকে যাই তাহলে সাহারা মরুভূমিতে গিয়ে পড়ব, তার মানেই বিপদ।

যাত্রাপথের প্রথম দিকে কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু শীঘ্রই আমরা এক রাশ বালিয়াড়ির মধ্যে গিয়ে পড়লাম। গাড়ি একবার ওঠে, আবার নামে, আর আমরা রীতিমত ঝাঁকুনি খাই। মাঝে মাঝে মরুভূমির ভৌতিক শূন্যতার আভাস পাই, বালিয়াড়ির ছায়া গভীর অন্ধকারে আমাদের আবৃত করে। বৃষ্টির জল ছোট ছোট নালা সৃষ্টি করে নাইজারের দিকে যাওয়ার ফলে লাঙল-চষা জমির মতো এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে গাড়িকে এগুতে হয়।

দিনেরবেলায় সাহারার দৃশ্য হচ্ছে—বালির সমুদ্র, মাঝে মাঝে বালির টিপি, মালভূমি, ইতস্তত আগাছা আর কাঁটা-ঝোপ, নরম বালিতে নিশ্চিহ্ন হওয়া পথ, ধুলির দৈত্যাকার ঘুর্ণিঝড়, নীল হ্রদ ও ছায়াঘেরা তালকুঞ্জের মরীচিকা।

সূর্যাস্তের সঙ্গে এই পটের পরিবর্তন ঘটে। মরুভূমি তখন অন্ধকার আর ভূতুড়ে ছায়ার রাজ্য। অদ্ভুত আকৃতির নানা ছায়া দেখে মনে হয় যেন কোন অজানা জীবজগতের অধিবাসীরা ইতস্তত: উপস্থিত আছে।

আমরা অনেক রকম ছায়া দেখি, কোন কোন ছায়া আবার কায়ালাভ করে। এক সময় আমরা চমকে উঠলাম আমাদের পথের উপর এক বিরাট প্রাণীর ছায়াময় রূপরেখায়। সাদা ভৌতিক মূর্তি গাড়ির হেড-লাইটের সীমানার মধ্যে আসতে আমরা তার স্বরূপ উপলব্ধি করলাম। ছায়ামূর্তি হচ্ছে একটা মরু-জাহাজ। নিঃসন্দেহে ওটা বুনো উট, কারও পোষা প্রাণী নয়। আমাদের পথের পাশে ঘুমোচ্ছিল, ইঞ্জিনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আমাদের দর্শন দিয়ে সবেগে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ক্রমশঃ পথ চেনা কষ্টকর হয়ে ওঠে। বালির মধ্যে পূর্ববর্তী যাত্রীদলের চিহ্ন দেখা গেলেও তা শত শত গজ ছড়ানো, ফলে রীতিমত বিভ্রান্তিকর। কোন জায়গায় পথে পাথরের চিহ্ন দেখে সেই দিকেই গন্তব্য মনে করে এগিয়ে দেখলাম বালির সমুদ্রে পথ হারিয়ে গেছে। ঝড় বালি বয়ে এনে পথ ঢেকে দেয়। অনুমানের উপর অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

রাত্রি প্রায় একটা নাগাদ একবার আমরা চকিতের জন্যে নাইজারকে দেখতে পেলাম। আলোর আভাস দেখে আমরা তার অস্তিত্ব বুঝতে পারলাম। আলোটা হচ্ছে তার বুকে কোন জলযানের, বোরেম ও গাও-এর দিকে সেটি চলেছে।

এই জায়গায় এসে আমাদের গাড়ির হেডলাইট বিগড়ালো। আলোটা মাঝে-সাজে যখন টিম্‌টিম করে উঠছিল, তখনই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। পরে টের পেয়েছিলাম যে ফ্যান-বেল্ট আলগা হয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যাটারী ঠিকমত চার্জ দিচ্ছিল না। যাহোক, ইঞ্জিন চালু থাকে। উজ্জ্বল চাঁদের আলো থাকায় গাড়ি-

চালাতে অসুবিধা হবে না বলে আমি ভাবলাম। কিন্তু হেডলাইটের অভাব কি চাঁদের আলো দূর করতে পারে? এই সত্যটি আমি মারাত্মক ভাবে উপলব্ধি করলাম এক ভাঙা ব্রিজের উপর যখন গাড়িটা উঠে পড়েছিল।

ব্রিজটা ছিল এক উপহ্রদের উপর। ব্রিজের উপর আমরা যখন অর্ধেকটা গেছি, তখন টের পেলাম বাকি আধখানার জায়গায় রয়েছে শুধু শূন্যতা।

আমি ব্রেক কষলাম, গাড়ির গতি কমল, কিন্তু একেবারে থামল না। বালিতে চাকা 'স্কিড' করে। ফলে ধীরে হলেও সুনিশ্চিত ভাবে আমরা ভাঙা ব্রিজের অস্তিত্বহীন অংশের দিকে এগিয়ে চলি। আমাদের সামনে শূন্যতার নিচে আছে অন্ধকার উপহ্রদ।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করল আমার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ চিৎকার—কুমির!

আমার স্ত্রী আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে নিচে উপহ্রদের দিকে ইঙ্গিত করে দেখাল। জিপটা প্রায় থেমে এসেছে, স্ত্রীর নির্দেশিত দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপের সময় আমি পেলাম। যেটুকু সামান্য আলো রয়েছে তাতে জানোয়ারটাকে দেখতে অসুবিধা হয় না। বৃহৎ এক কাষ্ঠখণ্ডের মত সে জলে ভাসছে, শুধু ভাসা নয়, আমাদের পতনের প্রতীক্ষা করছে। আমরা দেখলাম তার চোখে লুব্ধ দৃষ্টি, মুখটা ফাঁক হয়ে আছে, আসন্ন আহার্য জঠরে যেতে যাতে বাধা না হয় সেইজন্যে।

আমি ব্রেকটা একবার আলগা করে আবার চেপে ধরলাম। গাড়ির স্কিডের দিক পরিবর্তন ঘটল, ব্রিজের এক ধারে সে ধাক্কা দিল। একটা মড়মড় শব্দ জাগে এবং একটি থাম খসে পড়ে। ব্রিজের সঙ্গে এই সংঘর্ষ কিন্তু গাড়িটার গতি রুদ্ধ করে তাকে থামিয়ে দিল।

বীমটা জলে পড়ে বরাতক্রমে কুমিরটাকে আঘাত করে। পিঠে

কোন অদৃশ্য শত্রু আঘাত করেছে ভেবে সে রেগে লেজের ঝাপটা মারে। জল তোলপাড় হয়। কাদার মধ্যে নারকীয় তাণ্ডব শুরু হলো। কুমির ভাবে তার অদৃশ্য শত্রু 'রণং দেহি' বলে সম্ভবতঃ আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। সে এবার রেগে ক্ষেপে উঠল। অনবরত লেজ ঝাপটায় আর ঘুরপাক খায় শত্রুর সন্ধানে।

নিজেরা খুব বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে থাকলেও সবিস্ময়ে আমরা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে থাকি। নড়বড়ে ভাঙা কাঠের ব্রিজ যে কোন মুহূর্তে ওই নাটকীয় দৃশ্যের অংশীদার আমাদেরও করে তুলতে পারত। যাহোক, শ্রান্ত হয়ে বা ভ্রান্তি দূর হলে কুমির অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে অনর্থক সংগ্রাম পরিত্যাগ করল। সে আমাদের দৃষ্টিশক্তির ও শ্রবণশক্তির বাইরে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপহ্রদ আবার নীরব নিথর হলো।

ভাগ্যিস আমি ইঞ্জিন চালু রেখেছিলাম, তাই জীর্ণশীর্ণ ব্রিজের মাঝে ওই বিপজ্জনক পরিস্থিতির থেকে ধীরে ধীরে খুব সাবধানে পিছু হটে আসতে পারলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরে আমাদের গাড়ির চাকা শক্ত জমিতে ঠেকল। আমি উপহ্রদের দিক থেকে গাড়িকে ঘুরিয়ে নিলাম।

এখন বেনের কাজ হলো এই জলাভূমির মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে বের করা। সে চারপাশটা একটু অনুসন্ধান করে এসে জানাল যে একটা পথ খুঁজে পেয়েছে। তার নির্দেশ মতো আমি গাড়ি চালালাম। এক উঁচু বালিয়াড়ির উপরে উঠে সেটাকে পেরিয়ে অন্য ধারে নামতে পথের চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম।

আবার আমরা এগিয়ে চলি। আমার মনে ভয় থাকে যে ইঞ্জিন যদি একবার থামে তো তাকে ফের চালু করা মুস্কিল হবে।

খুব বেশি দূর যাবার আগেই সাহারার দিক থেকে এক ভীতিজনক সোঁ-সোঁ শব্দ ভেসে এল। কাঁটা-ঝোপে কাঁপন জাগল।

আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি কী ঘটতে যাচ্ছে—

*মরুঝঞ্ঝা। সমসিন, গিবলি, হারমাতান,—সাহারার বিভিন্ন অঞ্চলে* এই মরুঝড়ের বিভিন্ন নাম। কিন্তু যে নামেই ডাকা হোক না কেন, সব অঞ্চলেই এর প্রচণ্ডতা একই রকম। চাবুকের মত আঘাত করে, সঙ্গে বয়ে আনে উত্তপ্ত বালুকাকণার বন্যা, এর ছুটে যাওয়ার পথে কোন হতভাগ্য পথিক পড়লে অন্ধ হয়ে যায়।

'আমাদের কোথাও আশ্রয় নেওয়া ভাল,' আমি বললাম। কারণ আমি জানি এই ঝড় যদি সত্যি সেরকম প্রচণ্ড হয়, তাহলে বয়ে আনা বালুকারাশির তলায় আমাদের গাড়ি সহজেই চাপা পড়ে যাবে এবং সেইসঙ্গে আমরাও।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। টর্চের সাহায্যে এক বালিয়াড়ি খুঁজে বের করলাম, যেটির আড়ালে আশ্রয় নিলে ঝড়ের হাত থেকে মোটামুটি রক্ষা পাওয়া যাবে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি বালিয়াড়ির উপরে উঠে সেই ভয়ংকর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোয় তার রুদ্রমূর্তি চোখে পড়ে। বিদ্যুতের চকিত চমকে দেখলাম উট ও গ্যাজেল হরিণ আশ্রয়ের সন্ধানে মরু-ঝড়ের মধ্যে ভয়ে উন্মাদ হয়ে ছুটাছুটি করছে। একটু পরে বৃষ্টি নামল।

আমরা ভিজে জবজবে হয়ে গেলাম। কিন্তু তার জন্যে মোটেই দুঃখিত হই না। বৃষ্টি অল্পক্ষণ হলো। বৃষ্টির ফলে বাতাসের তীব্রতা হ্রাস পেল। মিনিট পনেরো পরে ঝড় আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। তার গতিপথের আভাস পাওয়া যায় ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক দেখে। ঝড় নাইজার পেরিয়ে সুদূরে মিলিয়ে যায়।

আমরা গাড়ির কাছে ফিরে এলাম। আমি ইচ্ছে করেই ইঞ্জিন চালু রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু এসে দেখি তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমি চালকের আসনে বসে গাড়ি স্টার্ট করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব চেষ্টা বিফল হলো।

মাঝরাতে সাহারার বুকে আমাদের গাড়ি বিগড়াল। উদ্ধারের কোন আশা এখানে নেই।

চালকের আসন থেকে আমি নীরবে নেমে এলাম। বেন গণ্ডগোল কোথায় হয়েছে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। পিছনের সিট থেকে আমার স্ত্রীও লাফিয়ে নেমে পড়ল।

মরুভূমির ঠাণ্ডা রাত্রি! হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা! জোয়ান গাড়ি থেকে এক মশারী টেনে বের করে গায়ে জড়াল। হাওয়া-দিয়ে-ফুলানো এক তোষক হাওয়া না ভরা অবস্থায় নিয়ে আমিও গায়ে চালাই। কেউ কোন কথা বলে না। অবস্থাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ!

তীব্র বিরক্তিতে দূরে সরে যেতে গিয়ে জোয়ান হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। দেখলাম সে তার পায়ের তলার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। তার পায়ের কাছে জমিতে বন্যজন্তুর একরাশ হাড়গোড় পড়ে রয়েছে। জন্তুটা ক্ষুধায় বা তৃষ্ণায় মারা গেছে। জ্যোৎস্নায় তার সাদা কংকাল চক্‌চক্‌ করছে।

আমরা উপলব্ধি করলাম আমদের অবস্থা কত ভয়ংকর। নির্জন মরুভূমির মধ্যে এই জন্তুটার মতোই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণায় মরতে হবে।

বেন কোন আশার বাণী শোনাতে পারল না। বনেটের নিচে খানিকটা নাড়াচাড়া করে সে তার স্বভাবসুলভ প্রফুল্ল কণ্ঠেই দুঃসংবাদ ঘোষণা করল,—'ফ্যানবেল্ট, মশাই, ফ্যানবেল্ট আমাদের সঙ্গে মজা করছে। দাঁড়ান, ওকে মজা দেখাই।'

বেন বেল্টটাকে টাইট করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইঞ্জিন স্টার্ট নিল না। একমাত্র উপায় স্টার্ট দেবার হ্যাণ্ডেল ব্যবহার করে দেখা। বেন হ্যাণ্ডেল লাগায় আর আমি চালকের আসনে বসি। ইঞ্জিন চালু করা গেল না। সে মিনিট খানেক চেষ্টা করে দম নেয়, আবার চেষ্টা করে। কোন স্পার্ক হয় না। আমি চেষ্টা করি। বৃথা চেষ্টা। আবার

বেনের পালা আসে। সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার ফলে গাড়ি কাঁপতে থাকে। আমি অ্যাকসিলেটার প্যাডেল অনবরত চাপি আর ছাড়ি। হঠাৎ স্পার্ক হলো! গর্জন করে মোটর জানাল তার পুনর্জন্ম হয়েছে। জীবনে যত শব্দ শুনেছি, তার মধ্যে এই মোটর গর্জন সবচেয়ে আনন্দদায়ক বলে বোধ হলো।

টিম্বুকটু পর্যন্ত সারা পথ ইঞ্জিন ঠিক মত চলে। বালিয়াড়ির পাশ কাটিয়ে উঁচু-নিচু বালুকাস্তূপ পেরিয়ে, লবণাক্ত ভূমির মধ্যে দিয়ে, গভীরভাবে চাকার দাগ কাটা রাস্তা ধরে, কাঁটা ঝোপ মাড়িয়ে আমরা চললাম। নীল আকাশে তারার নিশানা দেখে রাত্রির অন্ধকারে আমরা এগিয়ে চলি।

সকাল হয়, তবু আমাদের পথ চলা শেষ হয় না। এক জায়গায় আমরা পথ ভুল করলাম। বেশ কয়েক মাইল বিপথে গিয়ে এক নলখাগড়ার বনের মধ্যে পড়লাম। চারদিকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে নাইজারকে দেখতে পেলাম। সামনে কোন জন বসতির, জীবনের বা পথের চিহ্ন নেই। আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে যতটা এসেছি পিছন ফিরে আবার ততটা যাওয়া। সেখানে এসে আবার পথ খুঁজে বের করলাম। তারারা অস্তমিত হয়, আমাদের ঠিক পিছনে সূর্য ওঠে এবং আমি বুঝতে পারি আমরা ঠিক দিকেই চলেছি।

অবশেষে নটার একটু পরে আমরা মানুষের দেখা পেলাম। মরু অঞ্চলের এক শেখ উটের পিঠে তার স্ত্রীকে পিছনে নিয়ে আমাদের চোখের আসনে ভেসে উঠল। সে আমাদের সানন্দে সেলাম করল।

আমি গাড়ি থামিয়ে তাকে ডেকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আমার ভাষা বুঝতে না পেরে সে দাঁত বের করে হাসল। তারপর আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে উঁট চালিয়ে নীল দিগন্তের দিকে চলে গেল।

আমি বুঝি আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে খুব বেশি দূরে আমরা নেই। হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও মাইলের পর মাইল গাড়ি

হাঁকাতে হয়। যাত্রা পথের শেষে যে এসে গেছি এমন কোন চিহ্ন কিন্তু তখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

শেষে এক চওড়া সাদা বালির রাস্তায় এসে পৌঁছোলাম, যেটা আমরা যে পথ ধরে এতক্ষণ এসেছি তাকে আড়াআড়ি ভাবে কেটেছে। আমি স্থির করি বাঁ দিকের পথ ধরে অগ্রসর হওয়া। বালির রাস্তায় এগনো বেশ কষ্টকর হয়। কয়েক মাইল গিয়ে একটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম দূরে গোলাপী রংয়ের এক দুর্গের রূপরেখা।

কাছাকাছি যেতে সাদা পোষাক ও ফেজ টুপি পরা একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। আমি তাকে ফরাসা ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ জায়গাটার নাম কী?'

বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে সে বলল, 'এই জায়গার নাম হচ্ছে মশাই, টিম্বকটু।'

মেঘশূন্য নির্মল নীলাকাশে সূর্য বেশ উঁচুতে উঠেছে তখন। প্রখর রৌদ্রে মেঠো রংয়ের কুটিরে ভরা টিম্বকটু যেন ঝিমোচ্ছে।

নির্জন মালভূমি পেরিয়ে অবশেষে নস্যি রংয়ের নরম বালিভরা রাস্তা দিয়ে মিলিটারী ক্যাপ্টেনের বাড়ি—বো গেস্তে ক্যাসেল—পেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছোলাম শহরের প্রধান সড়কে।

সড়ক ধরে আমরা যখন অগ্রসর হই স্থানীয় জনসাধারণ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেখে। মরুভূমি থেকে একদল যাত্রী সবে এসে পৌঁছেছে। উট-চালকরা উট থামিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। উটেরাও মানুষদের আচরণ অনুসরণ করে।

এখানকার পুরুষদের মুখমণ্ডল ভালভাবে আবৃত হলেও স্ত্রীলোকেরা কোন লজ্জা না করে তাদের মুখ দেখায়। স্ত্রীলোকেরা তাদের মাটির বাড়ির ছাদে বসে আমাদের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আমরা তাদের দিকে হাত নাড়তে তারা ভয় পেয়ে যায় এবং

বাচ্চাদের তুলে নিয়ে ভীত চকিত হরিণীর মতো বাড়ির ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমরা প্রথমে পোস্টাফিসে গেলাম। আমাদের এই ভ্রমণের ডাক-বিভাগীয় কিছু স্মারক চিহ্ন পরিচিতদের পাঠাতে চাই। পোস্টমাস্টারকে জানালাম যে আমাদের স্টিমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করার জন্য আমি বন্দরে যেতে চাই। তিনি দরজার কাছে এসে আমায় দেখিয়ে দিলেন কোন পথে টিম্বুকটুর বন্দর কাবারাতে পৌঁছাব। বন্দরটা প্রায় মাইল ছয়েক দূরে।

টিম্বুকটু পৌঁছানোর পর এমন উঁচু-নিচু রাস্তা আমরা আর পাইনি। কিন্তু তার জন্যে আমরা কিছু মনে করি না, কারণ আমরা জানি সেদিনই খুব শিগ্‌গীর আমরা নদীর বুকে স্টিমারে উঠব এবং আমাদের স্থলপথে কষ্টকর ভ্রমণের অবসান হবে।

সাহারার কিনারা ধরে রাতে ভ্রমণের সময় আমরা কোন মানুষের দেখা পাইনি, কিন্তু কাবারা যাওয়ার এই বালুকাময় পথটি জনবহুলতার জন্যে বিলাতের পিকাডিলি পথের এক মরু-সংস্করণ বলে মনে হয়।

একক উটের সারি, দলবদ্ধ উটসহ যাত্রীদল জিপ ও ক্যাটারপিলার ট্রাক্টর ধরনের সেনাবাহিনীর গাড়ির সঙ্গে পথে আগে যাওয়া নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে। বেদুইনরা ঠ্যালাগাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে, কেউ আবার চাকা লাগানো হাতগাড়ি ঠেলছে। গাধার দল তাদের পিঠের ভার অনুযায়ী গতিশীল। কুলির দলের লাইন প্রাচীনকালের ক্রীতদাস দলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এই হচ্ছে টিম্বুকটুতে মাল সরবরাহের একটি সড়ক। প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পশু, প্রতিটি যান কিছু না কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে—মাছ, টিনের খাদ্য, পেট্রোল বা বীয়ার। এই রাস্তা থেকে আর একটু দূরে পরিবহণের জন্যে একটি খাল আছে, সেটি নদীকে বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

অবশেষে আমরা নাইজারে এসে পৌঁছোলাম। অদ্ভুত কর্ম চাঞ্চল্যের দৃশ্য এখানে দেখলাম। যতরকম ধরনের আর আকারের জলযান হতে পারে, তা সবই নদী এখানে যে চওড়া ঝিল সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করছে। মোটর লাগানো বিরাট ক্যানো, দু'তিন মাল্লার নৌকো, পাল তোলা নোকো, লগি মারা ডিঙি সকলেই পাড়ে ভেড়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে।

আমরা নদীর বুকে আমাদের স্টিমারের চিহ্ন দেখার চেষ্টা করি, কিন্তু তার ধোঁয়ার কোন লক্ষণ কোথাও দেখতে পাই না। লাল ফেজ পরা একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একগাদা লোক তাকে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করছে দেখে বুঝলাম সে কোন সরকারী কর্মচারী হতে পারে। আমি তার কাছে অগ্রসর হয়ে জানলাম সে হচ্ছে 'হারার-মাস্টার'।

আমি বললাম, 'গাওয়ে যাওয়ার জন্য আজ আমাদের বামাকো থেকে স্টিমার ধরার কথা।'

'আ, মঁসিয়ে, স্টিমার আসবে না।' উপর দিকে হাত তুলে সে কথাটা এমনভাবে ঘোষণা করল যেন এ ব্যাপারে সে খোদার দোয়া মাঙছে।

—'আসবে না!' আমি অবাক হলাম। 'কেন—কী জন্যে—আমার কাছে চিঠি রয়েছে—'

সে আবার হাত তুলে আকাশের দিকে চাইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার কাছে স্টিমার কোম্পানীর চিঠি আছে। আপনার কথা সত্যি হতে পারে। তবু কিন্তু স্টিমার আসবে না।'

আমি বুঝি তার সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ধৈর্য ধরে ব্যাপারটা জানতে হবে।

খানিকটা হতাশ হয়েই আমি বলি, 'আমাকে বলুন তো ব্যাপারটা কী ঘটেছে।'

—'সবকিছুর জন্য দায়ী ওই নদী। জলের লেভেল কমে গেছে।

যে স্টিমারটার আজ আসার কথা আছে সে এত কম জলে আসতে পারবে না। তাই ওরা একটা ছোট স্টিমার পাঠাচ্ছে।'

—'আজ—ঠিক সময়ে সেটা আসবে?'

—'দু'দিনের মধ্যে সেটা এখানে পৌঁছোবে।'

দু'দিন অপেক্ষা করতে হবে! অসম্ভব! সঙ্গে টাকা যা আছে তাতে কম পড়বে। তাছাড়া আমার ছুটির মেয়াদ মাত্র সাতদিন।

টুপি মাথায় ভদ্রলোককে আবার অসন্তুষ্ট যাত্রীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা টিম্বুকটুতে ফিরে যাওয়ার পথ ধরলাম।

খুবই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। আমরা সকলেই নির্বাক থাকি।

শেষে আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে যে পথে এসেছি, সেই পথেই আমাদের ফিরতে হবে?'

—'হ্যাঁ।'

এর বেশি আমি আর কী বলতে পারি?

# শ্বাপদ সাক্ষী

## (Spotted Alibi)

[ লেখক পল স্মাইলসের এই রচনাটি অত্যন্ত হাস্যকর হলেও সম্পূর্ণ সত্য। শুধু নায়কের নাম-ধাম একটু বদলে দেওয়া হয়েছে, যাব কাবণ কাহিনীটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে। ]

ভ্যান ডের হাম উত্তর রোডেশিয়ার এক জনবসতিশূন্য অঞ্চলে বাস করতেন। তিনি কাজ করতেন সরকারের পূর্ত-বিভাগের রাস্তা নির্মাণ কার্যে। এ কাজে মাইনে অবশ্য খুব কম পেতেন। তাহলেও তিনি খুব কাজের লোক ছিলেন এবং স্থানীয় কুলিদের কাছ থেকে যে-কোন লোকের চেয়ে তিনি অনেক বেশি কাজ আদায় করে নিতে পারতেন। তাঁর মতো কর্মঠ লোক একশো মাইলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সরকারী কাজ ছাড়া তার নিজস্ব একটি 'ফার্ম' ছিল—কয়েক হাজার কি তারও বেশি একরের রুক্ষ রিক্ত জমি, কাঁটা ঝোপে ভর্তি, যেখানে তিন-চারটি অলস অকর্মণ্য ছোকরা নাম মাত্র মাইনেতে এক পাল হাড় জিরজিরে গরু চরিয়ে বেড়াত।

তাঁর বাঁশ ও মাটি দিয়ে নির্মিত এক ফার্ম-হাউসও ছিল। সেটি তাঁর স্ত্রী একবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে দেখাশোনা করতেন। স্ত্রী তাঁর থেকে বোধহয় সব বিষয়েই বড় ছিলেন, দেহের ওজন ছিল তাঁর দ্বিগুণ, মানসিক শক্তি ছিল দশ গুণ এবং বাক্‌শক্তি আরও বহু গুণ বেশি।

ভ্যান ডের হাম তাঁর বংশগত প্রথানুযায়ী ফার্ম-ইয়ার্ডের মধ্যে এক গভীর কূপ খনন করেছিলেন। সংসারের জলের প্রয়োজন তাতেই মিটে যেত।

এ ছাড়া বাঁশ দিয়ে তৈরি একটা গোয়াল ঘরও ছিল। সেটি

একবারে গৃহসংলগ্ন হওয়ায় মাছিদের বিশেষ সুবিধা হলেও হানাদার চিতাবাঘদের পক্ষে খুবই অসুবিধাকর। এই গোয়ালে আধ ডজন গরু ও আহারের উপযুক্ত পারসীয়ান জাতের দু-তিনটি ভেড়া ছিল।

তাঁর ওই রাস্তা নির্মাণের কাজটি না থাকলে যান-বাহনের অভাব হতো, কিন্তু সরকার তাঁর এই অভাব দূর করে দিয়েছিল। তাঁর প্রতিবেশীদের বাসস্থান বহু মাইল দূরে হলেও এ নিয়ে মিসেস ভ্যানের কোন দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি। তাঁর চোদ্দটি ছেলেমেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে, গরুগুলির দুধ দুয়ে, দুধ হতে মাখন তুলে, জামাকাপড় কাচা সেরে, তিনটি পালিত শূকরের পরিচর্যা করে এবং শাক্-সব্জির বাগান দেখাশোনা করে মিসেস ভ্যানের আর সময় থাকতো না প্রতিবেশীদের সঙ্গে সামাজিকতা করার।

চাকরির আয় ও প্রতি বছর কিছু গৃহপালিত পশুর শাবক বিক্রয় করে ভ্যান সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য ব্যয় নির্বাহ করতেন। প্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকাও বিশেষ বড় নয়,—ময়দা, চিনি, নুন এবং আর ছিল 'ডোপ' নামে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্র্যাণ্ডি।

ভ্যান এই ডোপ লুকিয়ে নিয়ে এসে গোয়ালের গোবরগাদায় পুঁতে রাখতেন, কারণ তাঁর স্ত্রী টের পেলে মদের বাক্সের বারোটি বোতলের প্রত্যেকটি তাঁর মাথায় মেরে ভাঙতেন। খাড়িতে দু-এক ঢোঁকের বেশি ভ্যান কখনও খেতেন না, পাছে মিসেস ভ্যান বুঝতে পারেন স্বামীর এক গুপ্ত ভাণ্ডার আছে। এইসব কারণে সুবিবেচক ভ্যান মদের বোতলকে তখনই সঙ্গের সাথী করতেন, যখন ওই রাস্তা নির্মাণের কাজে তাঁকে সারা রাত বাইরে থাকতে হতো কিংবা যখন আটষট্টি মাইল দূরে তাঁর বহু দিনের 'এক গ্লাসের ইয়ার' বোয়েটি ভ্যান হীরডেনের কাছে যেতেন।

ভ্যান তাঁর বাৎসরিক বিক্রয়ের বাছুরগুলিকে বন্ধু বোয়েটির ফার্মে পাঠিয়ে দিতেন, সে সেগুলিকে বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে যেত।

বোয়েটি বিশ্বাসী বন্ধুর কর্তব্যই করতো, অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিয়দাংশ দিয়ে ভ্যানের ডোপ কিনে আনতো।

অবশ্য এই কারসাজির জন্য দু বন্ধুতে কিছুটা চালাকীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হতো। কারণ মিসেস ভ্যান বিক্রি করার জন্তুগুলি আগেই গুণে রাখতেন, তাদের বাজার দরের খবর রাখতেন এবং সর্বোপরি তিনি হিসাবপত্রেও পাকা ছিলেন। সেজন্য জন্তুগুলি বাজারে বেচার বেশ কয়েক মাস আগে একটি জন্তু হঠাৎ হারিয়ে যেতো এবং বেচার ঠিক আগের দিন পর্যন্ত সেই হারানো জন্তুটি বোয়েটির জমিতে চরে বেড়াতো। বিক্রির পরে ভ্যান টাকা আনতে যেতেন। সেই সময় তাঁরা ওই ব্র্যাণ্ডির বাক্সের সদ্ব্যবহার করতেন। পরদিন সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে তাঁর সরকারী গাড়ি চড়ে এবং বিক্রির টাকা ঠিক মতো নিয়ে ভ্যান স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতেন।

এই ব্যাপারটা মিসেস ভ্যানকে সর্বদা বিভ্রান্ত করতো। তিনি তাঁর স্বামীটিকে বেশ ভাল করেই জানতেন। তিনি আরও জানতেন যে বোয়েটির স্ত্রীও স্বামীর উপর কড়া নজর রাখে। কাজেই মিসেস বোয়েটির সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে দু বন্ধুর পক্ষে বাড়িতে মদের আড্ডা জমানো অসম্ভব।

কিন্তু মিসেস ভ্যান একটি বিষয় জানতেন না। সেটি হচ্ছে সন্দিগ্ধমনা মিসেস বোয়েটি টাকা পয়সার ব্যাপারে নিজের স্বামীকে বিশ্বাস না করার জন্য নিজেই বাজারে যেতেন নিজেদের গরু-বাছুর বিক্রি করার ব্যাপারে। তিনি বোয়েটির গাড়িটা নিয়ে যেতেন, যাতে বাহনহীন বোয়েটি অচল হয়ে নিজের বাড়িতে থাকতে বাধ্য হবে।

বাড়ি ছেড়ে মিসেস বোয়েটির শহরে যাওয়াটাকেই দু বন্ধু সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ভ্যানের বাড়তি বাছুরটির ক্রেতার সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত করেছিলেন যে সে দামের কিছুটা নগদ অর্থের বদলে দু বাক্স মদের বোতল দেবে এবং এই বাক্স দুটি মিসেস

বোয়েটির শহরে যাবার ঠিক আগের দিন পাঠিয়ে দেবে। যাহোক, দু বন্ধু যেভাবে তাদের স্ত্রীদের বোকা বানাতেন, সে সম্বন্ধে স্ত্রীরা একেবারে অন্ধকারেই ছিলেন।

মিসেস বোয়েটির অনুপস্থিত কালে দু বন্ধু যেসব বোতল ফাঁক করতেন, সেসব ঠিক মত সরিয়ে ফেলার জন্যে তাঁরা আর এক সহৃদয় প্রতিবেশীর সাহায্য নিতেন। বলাবাহুল্য সেও এই গোপন পার্টিতে যোগ দেওয়ার আনন্দ হতে নিজেকে বঞ্চিত করতো না। পরদিন ভদ্রমহিলা যখন শহর থেকে টাকা নিয়ে ফিরতেন, তখন তাঁর বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও শান্ত। আগের দিনের সারা রাত্রি ব্যাপী পার্টির কোন চিহ্ন কোথাও নেই। নেশা ছোটার পর তাঁর স্বামী ও ভ্যান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ভ্যান তাঁর ভাগের টাকা বুঝে নিয়ে গৃহে রওনা হতেন।

কিন্তু এবার এক অঘটন ঘটল। মিসেস বোয়েটি পরদিন না ফিরে মাঝ রাতের একটু পরেই বাড়ি এলেন। সে সময়ে পার্টি পুরোদমে চলছিল। মাতালদের হৈ-হল্লা তিনি বোধহয় কয়েক মাইল দূর থেকেই শুনতে পেয়েছিলেন। একটা পুরানো গ্রামোফোনের উৎকট শব্দের সঙ্গে ভ্যাজ্জি ভ্যান জার্স ভেল্ট রান্নাঘরের মাঝখানে এক বন্য নাচ জুড়েছিল এবং দু বন্ধু তাকে উৎসাহিত করার জন্যে প্রাণপণ চিৎকারে গান করছিলেন।

ছটি শূন্য মদের বোতল মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল এবং সপ্তম বোতলটি নিয়ে বোয়েটি ভ্যাজ্জির গলায় ঢেলে দেবার চেষ্টা করছিল, যাতে নাচের সঙ্গে তার কণ্ঠ হতে গান নির্গত হয়। বাক্সের বাকি বোতলগুলি টেবিলের উপর সযত্নে সাজানো ছিল।

হঠাৎ কুকুরগুলি ডাকতে শুরু করায় পানোন্মত্তরা বুঝল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। বোয়েটির পুরানো ভজগাড়ির হেড লাইটের আলো কাঠের গেট পেরিয়ে রান্নাঘরের খোলা জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব গোলমাল এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বোয়েটি ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'আমার স্ত্রী এসে পড়েছে!'

বিদ্যুৎ-বেগে সে মেঝের বোতলগুলি কুড়ানো শুরু করে দিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একটি খালি বোতলের উপর তার পা পড়ায় হড়কে গিয়ে সে ডিগবাজি খেল। অন্যেরা তাকে তুলতে এগিয়ে আসে না। তারা তখন 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করছে। ভ্যাজি পাশের জানালা দিয়ে লাফ মেরে ফুলের বাগানে মিসেস বোয়েটির প্রিয় পিটুনিয়া গাছগুলিকে ধূলিসাৎ করে পালায়। ভ্যান ডের হাম ঝড়ের বেগে খিড়কির দরজার দিকে দৌড়োন।

মিসেস বোয়েটির গাড়ি যখন গেট পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দার কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন ভ্যান বাড়ির পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে নিজের গাড়িতে চেপে একবারে সেকেণ্ড গিয়ারে গর্জন করে বেরোবার সময় ধাক্কা মেরে গেটের একটা পাল্লাকে উড়িয়ে দিয়ে যান।

তাঁর গাড়ি যখন তীব্র বেগে একপাশে হেলে বাঁক ঘোরে। তখন তাঁর বাচ্ছা চাকর দুটি বিড়ালের মতো লাফিয়ে তাঁর শরীর পিছনে উঠে পড়ে। বোয়েটির চাকর তার ঘরে আবার আর একটা ছোট পার্টি বসিয়েছিল ওদের দুজনকে নিয়ে। কথায় বলে 'যেমন গুরু, তেমনি চেলা',—এদের ক্ষেত্রে এটা একবারে ধ্রুব সত্য!

ভ্যান এমনভাব গাড়ি চালান যেন তাঁকে ভূতে তাড়া করেছে। তাঁর বিশ্বাস কোনরকমে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে পারলে আজকের এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। মিসেস বোয়েটি তাঁকে দেখতে পাননি। তা সত্ত্বেও যদি তিনি বলেন যে দেখেছিলেন, তাহলে ভ্যান শপথ করে তাঁর কথা উড়িয়ে দেবেন এবং বলবেন যে রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্যে আজ তিনি বন্ধুর ওখানে যেতেই পারেন নি। গরু-বাছুর বিক্রির দিন রাতে বাড়ি ।তনি সাধারণতঃ ফেরেন না, একবারে বিক্রির টাকা নিয়ে পরদিন ফেরেন।

আজ টাকা না নিয়ে ফেরায় দুই মহিলাই তাঁর কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন।

পাগলের মতো তিনি গাড়ি চালান। জঙ্গলের বালিভরা পথে গাড়ি লাফাতে থাকে, হেডলাইটের আলো এক গাছ থেকে অন্য গাছে ঝাঁপ মারে। পিছনের ছোক্‌রা দুটি ভয় পেয়ে খোলা লরীর দু পাশ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে।

কয়েক এক মাইল তীব্র বেগে অতিক্রম করার সঙ্গে ক্রমশঃ ভ্যান ধাতস্থ হয়ে ওঠেন। কারণ প্রতিটি মাইল তাঁকে মিসেস বোয়েটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যায়। মিসেস বোয়েটির তাঁর পিছনে ধাওয়া করার সম্ভাবনা ভ্যানের মনে ছিল।

অবশেষে এক লম্বা স্বস্তির শ্বাস ফেলে তিনি অ্যাকসিলেটারের উপর থেকে পায়ের চাপ আলগা করলেন। কপালের ঘাম মুছলেন। আর তখনি চিতাবাঘটিকে দেখতে পেলেন!

চিতাবাঘটি একেবারে পথের মাঝখানে এমনভাবে বসেছিল যেন কারও বাড়ির পোষা বিড়াল।

তখনও কিছুটা নেশার ঘোরে থাকলেও ভ্যান যথা কর্তব্য ভোলেন না। তিনি ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন। হাত বাড়িয়ে জঙ্গল-জীবনের নিত্য সঙ্গী রাইফেলটা পাশ থেকে তুলে নিলেন। মনে ভাবলেন তিনি যে মদের আড্ডায় না গিয়ে রাতে জঙ্গলে কাজে ব্যস্ত ছিলেন তার এক উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। স্ত্রীকে বোঝাবেন মদ খেয়ে মাতলামি করলে তাঁর পক্ষে শিকার করা সম্ভব ছিল না।

গাড়ির হেড-লাইটের তীব্র আলোয় চোখ ধেঁধে যাওয়ার ফলে বাঘটার উঠে দাঁড়াতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যেই ভ্যান দৌড়ে গিয়ে তার মাথায় রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন। একমাত্র মাতালের পক্ষেই এমন বীরত্বের কাজ সম্ভব।

হঠাৎ মাথায় আঘাত পেয়ে চিতাটা অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ভ্যান আনন্দে চিৎকার করেন, 'এই ছোঁড়ারা, শিগ্গীর গাড়ি থেকে নেমে আয়। দেখ, আমি গুলি না করেই বাঘ মেরেছি। আমার বাঘটাকে গাড়িতে তুলে নে।'

ছোকরা দুটি নেমে আসে। নীরব নিথর শায়িত চিতাবাঘ দেখে খুবই উত্তেজিত হয় এবং তারাও অল্প-বিস্তর নেশার ঘোরে থাকায় কোন বিচার-বিবেচনা না করে দুজনে মিলে চিতাকে টেনে গাড়িতে তোলে। মনিবের বীরত্বে তারাও নিজেদের বীর বলে মনে করতে থাকে।

ভ্যান উচ্চকণ্ঠে হেসে তাদের বলেন, 'দেখেছিস কেমন বাঘ মারলাম? এ কি কোন মাতালে পারে? কথাটা তোদের গিন্নিমাকে বলবি। এখন চল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যাক্।'

ভ্যান বেশ খোশ-মেজাজে গাড়ি হাঁকান বাড়ির দিকে। মেজাজ ভাল হয়ে ওঠায় নিজের সঙ্গেই কথা বলা শুরু করেন এবং গাড়ির গতিও বৃদ্ধি করেন। অর্থাৎ চিন্তার ফলে তার মস্তিষ্ক যেটুকু ধাতস্থ হয়ে উঠেছিল, এই কার্যের উত্তেজনায় মস্তিষ্কের কোষগুলি আবার আচ্ছন্নভাব ধারণ করে। নেশাটা আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে ভ্যান মুখ ঘুরিয়ে গাড়ির পিছনের জানলা দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন ছোকরা দুটো কী করছে। তাদের বকবকানি শুনতে পাচ্ছেন না কেন?

তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। জানলার কাঁচের ওপাশে চিতাবাঘটা তাঁর দিকে চেয়ে আছে। ছোকরা দুটি বেপাত্তা। বাঘটার হুঁশ ফিরে আসতে বিপদ বুঝে তারা চলতি গাড়ি থেকেই লাফ মেরে হাওয়া হয়ে গেছে।

এক গাছের সঙ্গে গাড়িটার ধাক্কা খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ভ্যান পিছন থেকে মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্টিয়ারিংয়ে তাঁর হাত দুটি কাঁপতে থাকে এবং চোখ দুটি রসগোল্লার

মতো গোল হয়ে ওঠে। লরীর পিছনে তিনি একটি আহত ক্রুদ্ধ চিতাবাঘকে বহন করে নিয়ে চলেছেন, আর বাঘটি জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে একদৃষ্টিতে চালকের দিকে চেয়ে আছে। ভ্যানের মাথার চুল তো বটেই, গায়ের রোমগুলি পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল।

শেষের দু মাইল তিনি কয়েক মিনিটে অতিক্রম করলেন। খোলা গেট দিয়ে ধুলির ঝড় তুলে সদর দরজার সামনে এসে ব্রেক কষলেন। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে প্রাণপণে দৌড়ে সামনের সিঁড়ি ভেঙে দরজায় সামনে পেঁৗছাতে না পেঁৗছাতেই দরজা খুলে যায়। মিসেস ভ্যান গাড়ির শব্দ শুনে দরজা খুলতে এসেছিলেন।

চিতাবাঘটি গাড়ি থামতে সুযোগ বুঝে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে জীবনে মোটরগাড়ি চাপেনি, তাই গাড়ি থামা মাত্রই সেও প্রাণভয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল।

ভ্যান ভয়ে তাঁর বিশালবপুধারিণী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'বাঘ—আমি বাঘ নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। মদের আড্ডায় যাইনি। জঙ্গলে ছিলাম। ওই জ্যান্ত বাঘ তার সাক্ষী।'

—'আবার তুমি মাতলামি করছো?' মিসেস ভ্যান চিৎকার করে উঠলেন।

তারপর সকালে গোবরের গাদায় লুকানো যে দের বোতলগুলি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, তারই একটি দিয়ে স্বামীর মাথায় সজোরে মারলেন।

ভ্যান বাঘের মাথায় মেরে তাকে অজ্ঞান করেছিলেন, এবার তাঁর নিজের অজ্ঞান হবার পালা।

# স্বর্ণ খনির সন্ধানে

## (How far, gold ridge)

[ দুর্গম অরণ্য ও দুরন্ত নদীর বাধা অতিক্রম করে লেখক পি. এল. এন প্যাডফিল্ড স্বর্ণরেণুর সন্ধানে গুয়াদাল ক্যানাল অঞ্চলে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন। তাঁর সোনার-স্বপ্ন বিফল হওয়ার করুণ কাহিনী। ]

সে ডেস্কের দেরাজ থেকে এক ছোট কাঁচের শিশি বের করল। ছিপি খুলে সযত্নে কিছু গুঁড়া পদার্থ এক খণ্ড পরিষ্কার ব্লটিংপেপারের উপর ঢালল। পদার্থটি ভাল করে দেখার জন্য আমরা ঝুঁকে পড়লাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এগুলি তাই ?'

সে জবাব দিল, 'সোনা! ভুল হবার নয়। দেখছ কেমন হলদে ?'

তর্জনীটা ভিজিয়ে নিয়ে সে গুঁড়োর উপর রেখে সন্তর্পণে তুলে নিয়ে আবার শিশিতে ভরে রাখল।

'এগুলি আমি দেড় দিনে সংগ্রহ করেছি। আমার মনে হয় যদি তুমি ওখানে এক মাস থাক তাহলে এই রকম শিশি ভর্তি করতে পারবে।'

স্বর্ণ-তৃষ্ণা! এই তৃষ্ণা দূর করার জন্য গাইড পাওয়া শক্ত নয়।

ওই স্বর্ণ শৈল শিরার কাছাকাছি এক গ্রামের বাসিন্দা, বেটি নামে এক ছোকরা আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে রাজি হলো। এর জন্য তাকে দিতে হবে দৈনিক দু শিলিং আর তার 'কাই-কাই' অর্থাৎ আহার। অবশ্য বেশি কিছু নয়, ভাত আর মাঝে মাঝে টিনের মাংস।

দৈনিক দু শিলিং মজুরি আমার কাছে ন্যায্য বলেই মনে হলো। কিন্তু মাংসের ব্যাপারটা আমায় একটু চিন্তিত করল। কারণ আমি,

শুনেছি যাত্রাপথের কোন একটি জায়গার নাম হচ্ছে 'ক্যান-ও-মিট' অর্থাৎ মাংসের টিন। আরও শুনেছি যে এক সাদা চামড়ার মানুষকে ওখানে হত্যা করা হয়েছিল ওই মাংসের টিনের জন্যই।

যাহোক, সেটা অনেককাল আগেকার ব্যাপার। আজকাল সলেমানের স্বর্ণ ভাণ্ডারের চেয়ে অনেক বেশি বিপদ সংকুল স্থান অন্যত্র আছে। তাই বিপদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করে আমি কিছু কর্নড বীফের টিন কিনলাম এবং নিজের জন্যে নিলাম ফলের টিন।

বেটিকে বললাম, 'কাল সকালে প্রথম মুরগীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যাওয়ার জন্যে তৈরি হবে। ঠিক আছে?'

বেটি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। কিন্তু ঘড়ি অনুযায়ী সময় নির্ধারণের বদলে ঘড়ি বিহীন বেটির সঙ্গে মুরগীর ডাক অনুযায়ী সময় নির্ধারণ যে কত বিভ্রান্তিকর হতে পারে তা পরদিন সকালে বুঝেছিলাম।

সকালে কুলি-লাইনে শত শত নিদ্রিত মানুষের মধ্যে থেকে বেটিকে খুঁজে বের করতে আমার বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যাত্রার প্রথম অংশটুকুর জন্যে যে গাড়ি ঠিক করেছিলাম, তাতে অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে বেটিকেও তুলতে হলো। মালপত্রের মধ্যে অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে আমাদের খাদ্য-সামগ্রী ও দুটি বড় কালো প্যান।

হোনিয়ারা থেকে গুয়াদালক্যানালের কূল ধরে পূর্ব দিকের রাস্তাটি বেশ ভাল, ছায়া সুশীতল পথ। আমাদের সামনে বাঁ দিকে প্রথম প্রভাতের ম্লান আলোর ছটা প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল 'আয়রণ বটম সাউণ্ড'-এর কালো জলে। ডান দিকে ছিল তৃণাচ্ছাদিত শৈলশিরা, তাল গাছের সুন্দর সারি তাকে মাঝে মাঝে দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাচ্ছিল।

এই দ্বীপের এই সংকীর্ণ উপকূলের অঞ্চল পর্যন্তই সভ্যতার সীমানা। এরপরে হচ্ছে নিবিড় বনভূমি ও গম্ভীর আগ্নেয় গিরির

দেশ, পাশ্চাত্যের বিজয় কোন পরিবর্তন এখানে আনতে পারেনি। জেণ্ডেনা প্রথম যে আদিমতা এখানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আজও তা তেমনিই রয়েছে।

এই অঞ্চলে যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে পায়ে-চলা পথ, আর সেই পথ আপনা হতেই তৈরি হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের চলাচলের ফলে। ফলে এই পথ কোথাও আছে, আবার কোথাও নেই। কোন পথিক যদি একবাব পথভ্রষ্ট হয় তাহলে সে দিনের পর দিন বিপথে ঘুরে বেড়াবে এবং কোন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়ার আগেই ক্ষুধায় বা জ্বরে পরলোকের পথ খুঁজে পাবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমবা পথের শেষে পৌছোলাম। গাড়ির গীয়ার বদলে ড্রাইভার জিপ চলাব উপযোগী এক এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়িটা একটু চালায়। পথের দুপাশে লম্বা কুনাই ঘাসের জঙ্গল! এই পর্যন্ত এক পাহাড়ী টিলার কাছে শেষ হয়েছে। তারপর আঁকাবাঁকা লালচে ধুলা ভর্তি যে মেঠোপথ শুরু হয়েছে, তাতে যুদ্ধের ট্যাংক ছাড়া আর কিছুই চালানো চলে না। আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। সভ্যজগতের যান-বাহনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। আদিম মানবের মতো নিজের পদদ্বয়ে সম্বল করে এবার আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।

পদব্রজে ভ্রমণের প্রথম ঘটনাটি মোটেই কষ্টকর নয়। হাঁটু সমান উঁচু বুনো ঘাসের মাঝে মাঝে চোখে পড়ে বদ্ধ জলের ছোট ছোট পুকুর, এখানে-ওখানে ছড়ানো যুদ্ধের সময়কার কিছু মরচে-ধরা জিনিসপত্তর। তখনও পর্যন্ত সূর্য রুদ্রমূর্তি ধারণ করেনি। বেটি বোঝা কাঁধে খালি পায়ে আগে আগে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে। তার কোঁকড়ানো চুল চূণ মাখিয়ে সাদা করে নিয়েছে, যাতে কীট-পতঙ্গ মুখের কাছে এসে বিরক্ত না করে।

চারপাশে সবকিছু বদলাতে শুরু হলো। ঘাসের জঙ্গলের বদলে ঘন বন শুরু হলো—বড় বড় মোটা গাছে ভরা। খাড়া নদীর পাড়ে এক ভাঙাচোরা পুল পেলাম। কিন্তু আর একটা পরিবর্তন আমার পক্ষে কষ্টকর হয়। সেটা আমাদের পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন নয়, আমাদের বোঝা-বদল! আমি স্থির করেছিলাম বর্তমান যুগ অনুযায়ী আচরণ করব। আগের যুগের প্রভুদের মতো অধীন ব্যক্তিকে অধিক পরিশ্রম করাব না। শোষণ যুগের শেষে গণতান্ত্রিক যুগের আদর্শ অনুযায়ী চলব। প্রভু-ভৃত্যের ভেদ না রেখে সমান পরিশ্রম করব।

এক ঘণ্টা চলার পরে আমি গায়ের শার্ট খুলে ফেলে বেটির কাছ থেকে বোঝা নিয়ে নিজের কাঁধে চাপালাম। ঘড়িটা দেখিয়ে তাকে বললাম, 'একঘণ্টা পরে—মানে আটটার সময়—তুমি আবার এটা নেবে। এখন চল! ব্রিজ ভাঙা, নদীতে জল বেশি নেই, হেঁটেই পার হওয়া যাক।'

সে নদীর বুকে এক পাথরের খণ্ড থেকে অন্য খণ্ডে লাফাতে লাফাতে চলল। আমি তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে মাতালের মতো ধপাস করে জলে পড়ে গেলাম। জলের তলায় ডোবা এক মসৃণ গোলাকার পাথরের উপর লাফাতে গিয়ে পা পিছলে গিয়েছিল, তাছাড়া কাঁধের ভারী বোঝাটাও আমার ভারসাম্য নষ্ট করে ডিগবাজি খাইয়ে দিচ্ছিল।

এটা ছিল আমাদের পথের প্রথম নদী। তারপর কত নদী যে পড়ল তার ইয়ত্তা নেই। নদীর সংখ্যা গণনা ছেড়ে দিয়ে আমার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হলো হোঁচট খেতে খেতে অন্ধের মত বেটিকে অনুসরণ করে যাওয়া। সে কখনও কোমর-জল ভেঙে চলে, কখনও পাড় দিয়ে চলে। কোন নদী প্রথমটির মতোই খরস্রোতা, বুকভরা শ্যাওলাধরা পাথরের খণ্ড রয়েছে। কোন নদী আবার স্রোতহীন ধীরস্থির, ঘোলা জল, পাড়ে ঘন কাদা, তারপর হলদে ও সবুজ

ঝোপঝাড়—কুমারদের পক্ষে লোভনীয় বাসস্থান। বেটি বোধহয় এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না। যে রকম নির্বিকার ও বেপরোয়াভাবে সে চলেছে তাতে আমার মনে হলো সে হয়তো হঠাৎ কখন কোন ঘুমন্ত কুমিরকে মাড়িয়ে বসবে। কিন্তু এই চিন্তা আমার পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। কারণ পিঠের বোঝার জন্যে আমিও সেক্ষেত্রে একদম অসহায়।

বোঝাটা ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে বলে বোধহয়, যেমন সব বোঝাই হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পার হতেই আমি তাড়াতাড়ি সেটি বেটির কাঁধে আবার চাপিয়ে দিই। বোঝার স্ট্রাপে ইতিমধ্যে রক্তের দাগ লেগেছে, যে জায়গাগুলি আমরা দেহের চামড়ার সংস্পর্শে এসেছিল, সে জায়গাগুলিই রক্তাক্ত হয়েছে। ভারমুক্ত হয়ে আমি যখন হাঁটা শুরু করলাম তখন মনে হলো চাঁদে পেঁাছে গেছি, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় কম।

নদীগুলির বাধা পার হয়ে আমরা উচ্চভূমিতে ওঠা শুরু করলাম। অঞ্চলটা শৈলশিরা বহুল। আমাদের যাত্রাপথ সর্বদাই হচ্ছে সংকীর্ণ শৈলশিরাগুলির উপর দিয়ে। পথের দু পাশে জঙ্গলাকীর্ণ ঢালু জমি।

পা ফেলার জায়গা হচ্ছে জট পাকানো শিকড়। পথের মাঝে লতাপুঞ্জ এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যেন খরগোশ ধরার জন্যে কেউ ফাঁদ পেতেছে। শিকড়ে প্রায়ই পা আটকে যা ঝাঁকুনি খাই তাতে আমার চলার গতিবেগ বেড়ে যায়। মাথার উপরে দোদুল্যমান লতাপুঞ্জও আমার সঙ্গে কম রসিকতা করে না। ছোট কাঁটা ভরা তাদের শাখাগুলির তলা দিয়ে যাবার সময় দুষ্টু ছেলের মতো বিনানুমতিতে আমার মাথার টুপি তারা খুলে নিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে। কয়েক পা পিছিয়ে এসে আমাকে সেই টুপি উদ্ধার করে আবার যথাস্থানে রাখতে হয়।

পায়ের কাছের জঙ্গলে মাঝে মাঝে ছোট কালো সাপ সবেগে

চলে যায়। পায়ের দুপাশে বড় বড় গাছ সূর্যকে ধরার জন্যে আকাশে হাত বাড়িয়েছে। তাদের গুড়িগুলি সরু ও লম্বা, পঞ্চাশ ফুট বা তার বেশি উচ্চতা পর্যন্ত কোন শাখা নেই। ফলে রোদের তাপ চুইয়ে নিচে নেমে আসে।

নটার সময় বেটি বলেছিল, 'সোনার পাহাড়—খুব কাছে চলে এসেছে।'

কিন্তু দুপুর বেলাতেও আমাদের আরোহণ শেষ হলো না।

আমি শ্লেষের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার অচল সোনার পাহাড় সচল হয়ে কোথায় চলে গেল?'

সে বিড়বিড় করে কী জবাব দিল বুঝতে পারলাম না।

সওয়া একটার সময় আমরা এক আদিবাসীদের গ্রামে পৌঁছোলাম। সে সময় আমার বোঝা বওয়ার পালা। তাই বেটি এগিয়ে ছিল আর আমি বোঝার ভারে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমাকে বোঝা বইতে দেখে গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। আমার মনে এক অদ্ভুত গর্বের বোধ জাগল, করণ গ্রামবাসীদের চোখে আমি সম্ভবতঃ ধনতন্ত্রধ্বংসকারী ও শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। জানি না তারা আমাকে সম্মানের চক্ষে না অবজ্ঞার চক্ষে দেখল ;

বেটি তাদের সঙ্গে খুব দ্রুত কিছু কথাবার্তা বলে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তার মুখ একবারে ভাবলেশহীন। সে আমাদের জানাল যে আমরা পথ হারিয়েছি।

আমি কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে এক বাঁশের টেবিলের উপর বসে পড়ে জল চাইলাম। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক দন্তহীন বৃদ্ধ একটি ফাটা কাঁচের বোতলে জল এনে দিল। আমি সবটুকু জল গলায় ঢেলে দিলাম। লক্ষ্য করলাম নিরাপদ দূরত্ব থেকে মেয়েরা ও বাচ্চারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

মুরগীর দল ডানা ঝাপটে ও কোঁ কোঁ করে উত্তেজিতভাবে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে। একমাত্র লালচে শুয়োরের পাল আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছে না বলে মনে হলো। তালপাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরগুলির মাঝে জঞ্জালের স্তূপে তারা আহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সোনার পাহাড় কত দূরে?'

—'ও,—অনেক দূরে, স্যার।'

—'তবু কতটা দূর?'

—'এখন কটা বেজেছে, স্যার?' ঘাড় লম্বা করে আমার ঘড়িটা দেখার চেষ্টা করে সে জিজ্ঞাসা করল।

—'দেড়টা।'

—'ও, সাড়ে ছটার সময় আপনারা বোধহয় সোনার পাহাড়ে পৌঁছাতে পারবেন।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বলি, 'সাড়ে ছটা!'

আমি এক অল্পবয়সী গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলি আমাদের পথ-প্রদর্শক হয়ে সেখানে পৌঁছে দেবার জন্যে। তার পারিশ্রমিক নিয়ে খানিকটা দরাদরি করতে হলো, শেষে নগদ চার শিলিং আর গোটা ছয়েক সিগারেট দিতে হবে স্থির হলো। বেটির কাঁধে এবার বোঝাটা চাপিয়ে দিলাম। যদিও এখন আমার বোঝা বওয়ার পালা, কিন্তু বেটির অজ্ঞতার জন্যে হায়রানির ফলে আমি গণতন্ত্রের নীতি রক্ষা করতে পারি না।

আমাদের গাইড আরও খাড়া ঢালু জমি দিয়ে এক নদীর উপত্যকায় আমাদের নিয়ে গেল। তারপর অন্য পাড়ের চড়াই ভাঙা শুরু হয়। লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে প্রায় বিলুপ্ত পথ ধরে সে আমাদের নিয়ে চলে। শেষে জঙ্গলাকীর্ণ শৈলশিরাগুলির উপর দিয়ে আমাদের যেতে হয়। প্রচণ্ড গরমে জ্ঞানশূন্য হয়ে অন্ধের মতো আমি তাকে অনুসরণ করে চলি।

বেলা তিনটের সময় সামনে এক খুব খাড়া কঠিন চড়াই দেখিয়ে সেটার উপর উঠে বাঁ দিকে চলার নির্দেশ দিয়ে গাইড আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেল।

আমরা চড়াই ভেঙে উপরে উঠলাম। এতক্ষণে পথের ক্লেশ বেটিকেও ক্লান্ত করে দিয়েছে। তাই আমি দয়ার্দ্র হয়ে বোঝাটা নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। তারপর বাঁ দিকের একটা পথ ধরে তাকে অনুসরণ করি। আমি লক্ষ্য করলাম বাঁ দিকে পথ কিন্তু একটি নয়, বেশ কয়েকটি।

চারটের কিছু পরে বেটি পথ চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখে সেই ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি আবার ফুটে উঠল, যা আমি গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে আলাপেব পর লক্ষ্য করেছিলাম।

—এই পথটা ঠিক নয়, স্যার।'

—'ঠিক নয়?'

—'সোনার পাহাড়—এখানে নয়, স্যার।'

এক গাছে হেলান দিয়ে আমি বসে পড়লাম। হতাশা ও ক্লান্তিতে তখন একবারে ভেঙে পড়েছি। বোঝাটা আমার কাঁধ থেকে খসে পড়ল, তার স্ট্রাপের ঘেঁষটানিতে আমার চামড়ায় জ্বালা ধরে গেছে। বোঝার উপরটা খুলে আমার প্রিয় এক মাসিক পত্রিকা ও এক টিন আঙুরের রস বের করলাম। শার্ট দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম। তারপর বিশ্রামের জন্যে প্রস্তুত হলাম।

ক্লান্ত কণ্ঠে বেটিকে বললাম, 'এবার তুমি চারদিক খুঁজে তোমাদের সোনার পাহাড়টাকে বের করো।'

বেটিকে চলে যায় আর আমি ভাবতে থাকি যে সে কি আর ফিরে আসবে? পথশ্রমের পরিবর্তে সরে পড়ার এমন সুযোগ সে কি হাতছাড়া করবে।

যা হোক, সে কিন্তু ফিরে এল। সে জানাল যে সে ঠিক পথ

খুঁজে পেয়েছে। পিছন দিকে আবার খানিকটা ফিরে এসে আমরা এক নতুন পথ ধরলাম।

প্রায় ছটার সময় যখন আমি মনে করছিলাম আজকের রাতের মতো এই জঙ্গলের মাঝেই কোথাও ক্যাম্প করার কথা তখনই একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। আমাদের পথের উপর সেটা স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্যভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হলো। সবুজ ঘাসের জঙ্গলে ঘেরা বৃহদাকার বাড়িটি যেন রাতে আশ্রয়দানের জন্যেই আহ্বান জানাচ্ছে। আর আধ ঘণ্টা পরে হলে এত বেশি অন্ধকার হয়ে যেত যে দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতার জন্যে আমরা বাড়িটির অস্তিত্ব টের পেতাম না।

বাড়িটি সেই সময় নির্মিত হয়েছিল, যখন ভাবা গিয়েছিল যে ওই শৈলশিরা থেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোনা সংগ্রহ করা সম্ভব। খুব শক্ত ও ভাল সেগুন কাঠ দিয়ে এটা করা হয়েছিল। বাড়িতে একটি বেশ বড় লিভিং-রুম ও দুটি বেড-রুম আছে। বেড-রুমে শয্যার ব্যবস্থা আছে, অবশ্য তোষকগুলি এখন ছিঁড়ে গেছে। লিভিং-রুমে আছে কিছু বেতের চেয়ার, বড় ডাইনিং টেবিল ও চেয়ার এবং একটা ক্যাবিনেট, যার সামনেটায় এক কালে কাঁচ লাগানো ছিল। বাইরে আছে একটা গোল জলের ট্যাংক, নল দিয়ে জল আসার ব্যবস্থাও করা আছে। রান্নাঘর একটা আছে আর সেখানে এক প্রকাণ্ড রেফ্রিজারেটারও আছে।

আমি টেবিলের উপর বোঝাটা নামিয়ে রাখলাম। ক্লান্ত মাংসপেশীগুলিকে বিশ্রাম দিই। মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করি এই আসবাবপত্র ও রেফ্রিজারেটার এখানে কাঁধে করে এই দুর্গম পথ ভেঙে নিয়ে আসার জন্য কুলিদের কী ভীষণ কষ্ট করতে হয়েছে।

হোনিয়ারাতে আমি শুনেছিলাম যে স্বর্ণ-শৈলশিরার বাড়িতে একজন কেয়ার-টেকার থাকে এবং সে প্লেট, সস্‌প্যান, মগ ইত্যাদি সরবরাহ করে। কিন্তু সে রাতে কোন কেয়ার-টেকারের সন্ধান

পেলাম না। আর শুধু সে রাতে নয়, আমরা যদ্দিন ওখানে ছিলাম তার মধ্যে একবারও তার দেখা পাইনি। রান্নার জিনিসপত্তর সব এক তালাবদ্ধ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেই আমরা সান্ত্বনা লাভ করলাম। তালাটা আবার এমন মজবুত, যে কোন রকমে খোলার চিন্তা করাটাও বাতুলতা।

বেটি রান্নাঘর হাঁতড়ে এক বিরাট কালো কড়া জোগাড় করল। সে স্থির করল তার ভাত রান্না ওতেই সেরে নেবে।

আমি বললাম, 'ওটা একজনের ভাত রান্নার চেয়ে একটা আস্ত শুয়োর রান্নার উপযোগী।'

বেটি প্রাণখুলে হেসে আমার মন্তব্যকে সমর্থন করল।

তারপর সে আগুন জ্বেলে কড়া তাতাতে শুরু করল। ইতিমধ্যে আমি তরমুজের খোলা দিয়ে কাপ আর চওড়া তালপাতার ডাঁটা দিয়ে চামচে তথা চীনাদের চপস্টিক বা খাওয়ার কাঠি তৈরি করে নিলাম। তারপর রেফ্রিজারেটার থেকে এক বরফের ট্রেকে থালা হিসাবে ব্যবহার করে বেটির রান্না করা খানিকটা গরম ভাত টিনের আইরিশ স্ট দিয়ে খেলাম। তার সঙ্গে পেঁয়াজের সুপও ছিল গলা ভেজাবার জন্য। তারপর সোয়েটার ও কম্বল গায়ে দিয়ে একটা বিছানায় চিৎপটাং হয়ে পড়লাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। পাশের শোবার ঘরটিতে আগুন লেগেছে। বাঁশের পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে আগুনের শিখার আভাস পাই, পোড়া গন্ধও নাকে লাগে। বিছানা থেকে এক লাফে নেমে দৌড়ে পাশের ঘরে গেলাম।

মেঝের মাঝখানে এক তোষকের উপর বেটি পরম আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। তার পাশেই আগুনটা জ্বলছে। সে বাইরের কোনখান থেকে এক লম্বা চ্যাপ্টা টিনের পাত জোগাড় করে এনে তাতে কিছু শুকনো ডালপালা রেখে আগুন জ্বালিয়েছে। তার পরনের প্যান্ট ছাড়া অন্য কোন জামা-কাপড় না থাকায় এবং রাতে বেশ শীত পড়ায়

সে এই অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। যতটা আতংকিত হয়েছিলাম, তারচেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আবার আমার ঘরে ফিরে এসে আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিলাম।

পরদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙতেই আমার মনে প্রথম যে চিন্তা উদয় হলো তা হচ্ছে,—এবার সোনার সন্ধান।

দ্বিতীয় চিন্তাটিও সঙ্গে সঙ্গে মনে এল,—'আমি কি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারব ?

দেহের প্রতিটি মাংসপেশী অসাড় পাথর হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে আগের দিন যেন ফুটবল ম্যাচ খেলেছি অনভ্যস্থ দেহ নিয়ে। দু' পায়ে ও গোড়ালিতে বড় ফোস্কা পড়েছে, কোমরে বোঝার ঘর্ষণ লেগে দুটি বড় ঘা হয়ে গেছে।

সকালটা কিন্তু বড় সুন্দর। প্রাতরাশের সঙ্গে সেই কালো কড়ায় কফিও করে নিয়েছিলাম। তারপর আমারা নদীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, স্বর্ণ-আহরণের জন্য দুজনে দুটি প্যান হাতে ঝুলিয়ে নিতে ভুলিনি। .

নদীর গর্ভে সোনা পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু নদীতে যাওয়ার পথ বেশ বিপজ্জনক। স্বর্ণ-সন্ধানীরা এককালে জায়গায় জায়গায় গর্ত খুঁড়েছিল, এখন সেগুলির মুখ ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা পড়ায় অসতর্ক পথিকের কাছে রীতিমত মৃত্যুফাঁদ। গর্তের মুখে অজান্তে একবার পা দিলেই ছ' ফুট নিচে পড়ে দেহের কয়েকটি হাড় ভাঙবে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর আমাদের কানে জলকল্লোলের শব্দ এল। গাছপালার মধ্যে দিয়ে আমরা নদীর পাড়ে পৌঁছোলাম। নদীটি খরস্রোতা, গর্ভে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড রয়েছে, জল বেশ পরিষ্কার, স্বচ্ছ। গভীরতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। জলে প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা ঘন পিঙ্গলবর্ণের মাছেরা খেলে বেড়াচ্ছে। পাড়ে গ্রীষ্মাঞ্চলের চওড়া পাতার গাছ ও ফার্নের জঙ্গল।

নদীর জল যেখানটায় কম আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। বেছে বেছে ছোট নুড়ি ভরা মাটিতে আমাদের প্যান ভর্তি করতে লেগে গেলাম। গোড়ালি ডোবা ঠাণ্ডা জলে বেটি একদিকে আর আমি অন্যদিকে থাকি।

সারা সকাল আমরা এই কাজে মেতে থাকি যতক্ষণ না প্রচণ্ড সূর্য একবারে মাথার উপরে আসছে। কিন্তু আমাদের জল, মাটি আর নুড়ি ঘাঁটাই সার হচ্ছে, সোনার সন্ধান পাই না। মাধ্যাহ্নের আহারের পরও বেটি এই প্যানিংয়ে লেগে থাকে, কিন্তু তার বরাত ফেরার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আমি হাল ছেড়ে দিয়ে সুইমিং কস্টিউম পরে গভীর জলের সন্ধানে যাই।

এইভাবেই দিন কাটতে থাকে। শৈলশিরায় বাসকালে আমরা তিন রকম হলদে খনিজ পদার্থের সন্ধান পেলাম, কিন্তু আমি হোনিয়ারায় যে স্বর্ণরেণু দেখেছিলাম তার মতো এই খনিজপদার্থের একটিকেও দেখতে নয়। ধীরে ধীরে আমাদের সোনার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল।

আমাদের ওখানে থাকার শেষ দিনটির রাত প্রায় দুটোর সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ ঝড় ওঠার জন্যে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ে, বাঁশের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকানি দেখি। করোগেটেড টিনের চালে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনি। সকালে সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রায় একটানা বর্ষণ চলে। আমি অন্ধকারে জেগে চুপচাপ শুয়ে থাকি। মনে মনে ভাবি বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা নদী আর ক্ষুধার্ত কুমিরদের কথা। ঘরের বাইরে নালা দিয়ে তীব্র বেগে জল বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই।

সকালে যখন আমরা প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা শুরু করলাম, তখন সকালের সূর্য শক্তিশালী হয়ে উঠে চারপাশে জঙ্গলে জমা জলকে বাষ্পে পরিণত করতে লেগেছে।

খানিকটা পথ যেতে না যেতেই বৃষ্টিতে জমা-জলে আমার জুতো,

মোজা, প্যাণ্ট ভিজে গেল। যাহোক, কাঁধের বোঝা এবার অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, কারণ তার মধ্যে খাদ্যের ভার বেশ কিছু লাঘব করে দিয়েছে আমাদের এই কদিনের ক্ষুধা।

উৎরাইয়ের পথে আমরা বেশ দ্রুত যেতে সক্ষম হই। কিন্তু পথের বেশির ভাগ অংশেই ভিজে মাটিতে আমার রবার সোলের জুতো হড়কে যায় এবং আমি এক গাছের গুঁড়ি থেকে অন্য গাছের গুঁড়িতে সবেগে গিয়ে ধাক্কা খাই। বাচ্চারা যেমন পার্কে স্লিপ খায়, আমিও তেমনি এই পাহাড়-পথের প্রায় সবটাই পিঠ ও পাছা ঘসটে নামলাম।

নদীগুলির জলস্ফীতি সম্বন্ধে আমি যে ভয় করেছিলাম, বাস্তবে দেখলাম তাই ঘটেছে। প্রবাহমান জলের তলায় হাল্কা নুড়ির উপর ঠিকমত পা ফেলে চলা প্রায় অসম্ভব। কারণ ঘোলা জলস্রোতের তলায় অদৃশ্য পাথরগুলির মধ্যে বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না কোনটিতে পা ফেললে অচল থাকবে এবং কোনটি আমাদের পায়ের ধাক্কা ও জলের ধাক্কায় নড়ে উঠে আমাদের উল্টে ফেলে দেবে। উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে বন্ধুর পথে এগিয়ে চলি। কুমিরের ভয়টা আমার থাকলেও সৌভাগ্যক্রমে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হই না।

বেলা তিনটের সময় আমদের সেখানে পৌঁছাবার কথা ছিল, যেখানে গাড়িটা আমাদের তুলে নিতে আসবে। যাবার সময় বেটি যেরকম পথ ভুল করছিল, সেটা খেয়াল রেখে আমি গাড়িকে ওই সময়টা জানিয়েছিলাম। যাতে হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় থাকে। কিন্তু বেটি বোধহয় জীবনে এই প্রথম সঠিক পথ চিনে গাইড করল। ফলে ভুল পথে যাওয়ার দুর্ভাগ্যের চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে থাকতে পারে তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। আমরা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের দু ঘণ্টা আগে এসে পৌঁছোলাম।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছোনো সত্ত্বেও আমি হাঁটা বন্ধ করতে পারি না। আমার পায়ের ফোস্কা ও পাছার ঘা পেকে উঠেছে এই আবহাওয়া

ও জল লাগার ফলে। আমি হাঁটা বন্ধ করলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি ওগুলির উপর বসে পড়ে। তাই জ্বালাময় রোদে রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড়ে আমায় পায়চারী করে বেড়াতে হয়। আর বেটি গাছের ছায়ায় নাক ডাকিয়ে ঘুমায়।

অবশেষে ধূলির ঝড় তুলে গাড়ি এসে পৌঁছোল। আমার দুর্ভোগ শেষ হলো!

হোনিয়ারায় আমি আবার ফিরে এলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে স্বর্ণরেণু ভরার জন্যে যে কাঁচের শিশি নিয়ে গিয়েছিলাম, বেটি যাবার সময় যেমন শূন্য ছিল, এখনও তেমনি সম্পূর্ণ শূন্য। ওখান থেকে নিয়ে এসেছি শুধু জ্বর ও দেহে নানা ক্ষত। জ্বর ও ক্ষতগুলি আমার অঙ্গে কয়েক সপ্তাহ থেকে চলে গেল এবং যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল আমার 'স্বর্ণসন্ধানের স্বপ্ন।'

জ্বর ছাড়ায় ও স্বপ্ন ভাঙায় আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

# কাজের সাথী হাতি

## (Elephent Dam Buster)

প্রতিদিন সকালে আমাদের সঙ্গে আমার বুল-টেরিয়ার, জো আস্তানা ত্যাগ করে গাছ কাটার জায়গায় যাবে। আমরা গাছ কাটার তদারকী করতাম আর সে খুঁজে বেড়াত কোন কুকুর নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তার এলাকায় ঢুকে তার কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করছে কিনা। কোন জন্তুর পদচিহ্ন দেখতে পেলে সে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে সব বাধা অগ্রাহ্য করে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে ছুটবে।

তার চালচলন অনেকটা গোঁয়ার বুনো শুয়োরের মতন, সামনে কোন ঝোপ বা বাধা পড়লে সেটি এড়াবার জন্যে ঘুরে না গিয়ে প্রথমে চেষ্টা করবে সেটি ভেদ করে যাবার। কিন্তু বুনো শুয়োরের মতন তার গায়ের চামড়া পুরু নয় বলে, তার নাক থেকে শুরু করে সারা দেহে সব সময়েই কাটা-ছেড়ার চিহ্ন লেগে থাকে।

তার শিকার-অনুসন্ধান তাকে অনেক সময় বেশ কয়েক মাইল দূরে টেনে নিয়ে যেত এবং কারেনরা প্রায়ই তাকে দেখতে পেত যে আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্যে ভুল পথে ছুটে চলেছে। আমাদের কাছে এটা এক নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সন্ধ্যাবেলায় কেউ তাকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসবে এবং সে যতটা নিরীহ তারচেয়ে বেশি নিরীহের ভান মুখে ফুটিয়ে হাজির হবে। নিরুদ্দিষ্ট তাকে নিয়ে আসার জন্যে যে পুরস্কার আমায় প্রায় দিতে হতো, তাতে মনে ভয় ধরা স্বাভাবিক যে কুকুর পোষার খরচের বদলে একটি সাদা হাতি পোষার ব্যয় না শেষ পর্যন্ত আমায় বহন করতে হয়।

একবার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের দলের কিছু কুলি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে প্রচণ্ড হৈ-হল্লা শুরু করে দিল। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম এক বাঁশঝাড়ের উপর দিকে হাত দেখিয়ে

তারা চেঁচামেচি করছে, কোন জন্তু নাকি ওখানে উঠেছে। কুলিরা জানাল যে জন্তুটি হচ্ছে ভাল্লুক। কিন্তু আমি অনেক বইয়ে পড়েছি যে ভাল্লুকেরা বাঁশগাছে উঠতে পারে না, কাজেই ওটা অন্য কোন জন্তু হবে। যাহোক, কুলিদের চিৎকারে ভয় পেয়ে জন্তুটা তীব্র বেগে মাটিতে নেমে এসে দৌড় লাগাল। দেখা গেল কুলিদের কথাই ঠিক—জন্তুটা ভাল্লুকই। পণ্ডিতদের কেতাবী বিদ্যার চেয়ে জঙ্গলের মানুষদের জ্ঞান সঠিক।

ওই ভাল্লুকটিকে মানুষরা নির্বিঘ্নে পালাতে দিলেও জো ছাড়ল না। সে তার পিছু পিছু দৌড়ল।

যদিও ভাল্লুকের দৌড় চতুষ্পদ অন্য জন্তুদের তুলনায় মন্দ গতি-সম্পন্ন, তবু সে প্রাণভয়ে এত জোরে দৌড়ায় যে জো তার অনেক পিছনে পড়ে থাকে। ভাল্লুকটি শেষ পর্যন্ত বড় বড় পাথরের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেল। আমিও মনে মনে খুশি হলাম, কারণ খালি হাতে এক ক্রুদ্ধ ভাল্লুক ও কুকুরকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিছুকাল আগে আমাদের মতো এক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীকে তার দুটি বুল-টেরিয়ার ও ভাল্লুকের লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে যেভাবে নাকাল হতে হয়েছিল, তা আমার অজানা ছিল না।

তাছাড়া এই ধরনের বীরত্বপূর্ণ কাজে আমার অনাগ্রহের আরও কারণ হচ্ছে যে ভাল্লুকের ক্ষমতার প্রমাণ আমি পেয়েছি গাছে তারা যে ধরনের গর্ত করতে পারে তাই দেখে এবং ভাল্লুকেরা খর্পরে পড়া একটি মানুষের মুখ দেখে। তার মুখটা ভাল্লুক নখ দিয়ে খুবলে দিয়েছিল। ভাল্লুক পালাবার আগে তার মুখে নিমেষের জন্যে একবার হাত বুলাবার ফলে তার মুখের অর্ধাংশ উড়ে গিয়েছিল।

শ্যাম দেশের ভাল্লুকদের মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হিমালয়ের কৃষ্ণকায় জাতীয় ভাল্লুক। এরা খর্বাকৃতি, পিছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে পাঁচ ফুট উঁচু।

সাধারণতঃ এরা হিংস্র নয়, কিন্তু এদের মেজাজের কোন স্থিরতা নেই। এই খামখেয়ালী মেজাজের সঙ্গে এদের প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ও প্রতি পায়ের থাবার তিন ইঞ্চি লম্বা নখ যুক্ত হওয়ায় এরা জঙ্গলের অন্য সব প্রাণীদের চেয়ে সবচেয়ে ভয়ংকর, বিশেষ করে মানুষের কাছে।

প্রায় সপ্তাহখানেক পরে ঠিক ওই জায়গাটিতেই প্রধান গহ্বরের মধ্যে থেকে হঠাৎ এক সম্বর বেরিয়ে পড়েছিল। কারেন কুলিরা তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ায় সে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে পালায়। চেষ্টনাট-বর্ণের চমৎকার হরিণ সেটি, স্কটল্যাণ্ডের লাল হরিণদের চেয়ে আকারে বেশ বড়।

অত্যন্ত বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে সে সাবলীল গতি ও তীব্র বেগে দৌড়য়, তা দেখে রীতিমত আনন্দ পাওয়া যায়। তার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় কোন আশা না থাকলেও জো তার পিছু নিতে ছাড়ে না। পাথরে হোঁচট খেয়ে কয়েকবার বোকার মতো ডিগবাজি খেল জো এবং হরিণের গতির দশ ভাগের এক ভাগ গতি নিয়ে তার এই প্রচেষ্টা আমাদের কাছে বেশ হাস্যকর হয়েছিল।

জো মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে জঙ্গলেই রাত কাটাতো। একবার তো তিন রাত্তির তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। নেহাৎ বরাত ভাল ছিল বলে তাকে কোন বিপদে পড়তে হয়নি। ভয় বলে কোন কথা তার জানা ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে যে উৎসাহ নিয়ে কুকুর, ষাঁড় ও মোষের পিছনে ছুটে যায়, ঠিক তেমনি উৎসাহেই বাঘের দেখা পেলে তার পিছনেও ছুটবে। একবার সে তো আমাদের দাঁতাল হাতি পু-বুন-চুকে তেড়ে গিয়েছিল। আমার এটাও দৃঢ় বিশ্বাস যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে সেটাই হবে তার জীবনের শেষ লড়াই।

জঙ্গলে আস্তানা গাড়ার পর শিগ্‌গীরই আমাদের কাজকর্মের

নিয়মিত রুটিন চালু হয়ে গেল। ছ' দিন পরিদর্শনের কাজ ও একদিন দপ্তরের কাজ, সারা সপ্তাহে কোন ছুটি নেই, একমাত্র অসুস্থার ক্ষেত্র ছাড়া। পাহাড়ী গহ্বরের মুখে গাছ কাটা পরিদর্শনের চেয়ে দপ্তরের কাজ অনেক কম শ্রমসাধ্য। তবে আজকালকার ট্রেড-ইউনিয়নের যুগে 'সময়-মেনে-কাজের' নীতির বিচারে আমাদের কাজ সত্যিই আকর্ষণীয় বা আরামদায়ক নয়।

সকাল সাতটার আগে থেকে আমাদের কাজ শুরু হতো আর সাধারণতঃ একটার কিছু পরে আমরা ক্যাম্পে ফিরে আসতাম। তারপর স্নানাহার ও গরমের দুপুরে বেলা চারটে পর্যন্ত নিদ্রা। চারটের সময় বিকালের চা পান হতো।

সাড়ে চারটের থেকে প্রায় সাতটা—মাঝে মাঝে আটটা বা আরও রাত—পর্যন্ত রিপোর্ট ও চিঠিপত্র লেখা, ঠিকাদারদের সঙ্গে কথাবার্তা, কর্মীদের বেতন প্রদান ইত্যাদি কাজ চলতো। অর্থাৎ সপ্তাহে ষাট ঘণ্টা, সাত দিনে সপ্তাহ এবং প্রতি সপ্তাহে ছুটি-ছাটা বাদ—এই হিসাবে কাজ করা হতো। উষ্ণমণ্ডলে ইউরোপবাসীরা কাজ না করে অলসভাবে আরামে জীবন কাটায় এই রকম এক ধারণা বহু উপন্যাসে গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু জঙ্গলে আমাদের জীবন ছিল সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কয়েক শো গাছ কাটার পরে সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। তারপর ঝি-পাম নদীর ধারে বাঁশবনে বিশ্রামরত হাতিদের নিয়ে আসা হয় গিরি-গহ্বর হতে সেগুলিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ঢালু জমি বেয়ে উপরে উঠার সহজ পথ কয়েক দিন ধরে কারেনরা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সিধে চড়াইয়ের পথ আমাদের অল্পতেই ক্লান্ত করে ফেলে, তাই তারা একটু ঘুর হলেও আঁকাবাঁকা পথে উপরে ওঠার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা প্রথম দলের হাতিগুলিকে এনে হাজির করে, সঙ্গে থাকে কাঠ টানার বড় শেকল ও কাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতি। সকাল সাতটায় হাতিরা চড়াইয়ের পথে যাত্রা শুরু

করল। এই প্রথম দলের হাতিদের মাহুতকে একটি বিশেষ কাজ করতে হয় পরবর্তী দলগুলির সুবিধার জন্যে। মাথার উপরে পথের বাধাসৃষ্টিকারী ডালপালা বড় ছুরি দিয়ে হাতির পিঠে বসে কাটতে কাটতে এগোতে হয়।

হাতিদের খুব ধীরে শম্বুক-গতিতে অগ্রসর হতে হয়। বর্ষার জলে কর্দমময় চড়াইয়ের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলে হাতিরা নড়তে চায় না। এই পথে একবার কেন একশোবার গেলেও তারা কিন্তু তাদের পদক্ষেপের সতর্কতা পরিত্যাগ করবে না। তবে পথটা সড়গড় হয়ে গেলে যাতায়াতে তখন বিশেষ আপত্তি করে না এবং সময়ও তখন কিছুটা কম লাগে। তবে এই ধরনের চড়াই-ভাঙা হাতিরা যে খুবই অপছন্দ করে সেটা ঠিক। অবশ্য কারেণরাও তাদের হাতিদের সহজে রেহাই দেয় না এবং তাদের সব সময় লক্ষ্য থাকে চড়াই ভাঙতে যাতে সময় না নষ্ট হয়।

একবার প্রবেশ পথের ক্যাম্পে পৌঁছোলে প্রাণীগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয় সুন্দর বনভূমিতে চরে বেড়াবার জন্যে। উপত্যকা থেকে কর্মক্ষেত্রে পৌঁছতে ও কাজে হাতিদের চারদিন ব্যয় হয়, তারপর তারা নিচে নেমে বিশ্রামের সুযোগ পায় এবং দ্বিতীয় দল কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। চারদিনের মধ্যে একদিন উপরে উঠতেই লেগে যায়, জলাভাবে নিচে নেমে আসার আগে তিনদিন তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

বৃষ্টির জল জমা গর্ত ও ভিজে গাছপাতা থেকে সামান্য কিছু জল জীবগুলি পায় বটে, তবে সে জল তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এই জলাভাব দূর করার জন্য পিপেতে করে জল নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি।

সেগুন কাঠ সংগ্রহের এই কাজে হাতিদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কাটা গাছের গুঁড়ির কাছে, সেখানে গাছটিকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে রাখা হয়েছে। বর্ষাকালে যখন মাটি নরম ও জল জমে থাকে,

তখনও হাতি খুব খাড়া পথে যাতায়াত করতে পারে, কখনও পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তাকে প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে হয়।

পথের বাধা স্বরূপ যেসব ডালাপালা থাকে সেগুলি তারা শুঁড় দিয়ে বা দেহের ধাক্কায় সরিয়ে দেয়। রাস্তা বড় বড় পাথরে বন্ধ না হলে তারা আসবার পাত্র নয়। প্রতিটি বৃক্ষকাণ্ডের নিকট যাবার জন্যে আলাদা পথ আছে এবং কাঠের মণ্ডগুলি টেনে আনার জন্যে সে পথ মাত্র একবারই ব্যবহার করা হয়। সেজন্য ওই পথের বাধা ডালপালা ভালভাবে পরিষ্কার করে কাটা হয় না, যেমন করা হয় সর্বদা ব্যবহার করার পথগুলিতে।

গাছের গুঁড়ির কাছে পৌঁছে হাতি তার মাথা দিয়ে ধাক্কা মেরে কাঠের বড় বড় মণ্ডগুলিকে পরস্পরের থেকে আলাদা করে দেয়। কর্তিত গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালাপালা থেকেও কাষ্ঠমণ্ডগুলিকে পৃথক করে দেয়। সাধারণতঃ এই অবস্থায় জমি এত অসমান থাকে যে কাঠগুলিকে টেনে নেবার শেকলে বাঁধলে বিশেষ সুবিধা হয় না। হাতিতে মাথা দিয়ে ঠেলেই ঢালু জমির উপর দিয়ে সেগুলিকে নামাতে হয়।

খাড়া ঢালের উৎরাই যেখানে সেখানে কাষ্ঠখণ্ডকে একবার ধাক্কা দিলে সেটি হুড়মুড় করে ক্রমবর্ধমান বেগে নিজে গড়াতে থাকে। ঝোপঝাড় দলিত করে, প্রস্তরখণ্ড উৎখাত করে এক ছোটখাট ল্যাণ্ড-স্লাইড বা ধ্বংসের সৃষ্টি করে সে নামে, ঢালু জমি শেষ হলে বা বড় গাছ কিংবা পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা লাগলে তবেই তার গতিরুদ্ধ হয়। যেখানে ওই কাষ্ঠখণ্ড থামে, সেখানে হাতি খুব সাবধানে নামে, আবার সেটিকে মাথা দিয়ে ধাক্কা মারে। এইভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না সেটি এমন জায়গায় পৌঁচচ্ছে, যেখান থেকে তাকে টেনে নেওয়া চলে।

এই টানার জায়গায় কাঠের পৌঁছাতে অনেক সময় আধমাইল বা তারও বেশি দূর পথ ও কষ্টদায়ক স্থান অতিক্রম করতে হয়।

এই কাজের একমাত্র উপযুক্ত প্রাণী হাতি ছাড়া কেউ নয়। ছোট কাষ্ঠখণ্ডগুলি হচ্ছে আধ টন ওজনের, আর বড়গুলি সাত কিউসিক-মিটারের পাঁচ টনের বৃহৎ বনস্পতির, এদের নড়ানোর সামর্থ অন্য কোন জানোয়ারের নেই।

কাষ্ঠখণ্ডগুলি টেনে নেওয়ার জায়গায় পৌঁছোলে তখন তার দুই প্রান্তে টানার শেকল পরাবার উপযোগী গর্ত করা হয়। খুব সরু পাতের এক বিশেষ ধরনের কুড়াল সেগুন কাঠে এই ধরনের গর্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কাষ্ঠখণ্ডের প্রান্তসীমা থেকে ছ ইঞ্চি দূরে এই গর্তগুলি করা হয়। এই গর্তে শেকল পরিয়ে হাতির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধার পর হুকুম দেওয়া হয় টানার।

হাতি পায়ের উপর ভাল করে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে-সুস্থে একটু ঝুকে পড়ে। তারপর হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দেয়। সেই ঝাঁকুনির ধাক্কায় মাহুতের মাথাটা গলা থেকে উড়ে বেরিয়ে যাবে বলে মনে হয়।

এই ঝাঁকুনির ফলে কাষ্ঠখণ্ডটি তার অনড় অচল অবস্থা ত্যাগ করে ধীরে ধীরে হাতির চলার তালের সঙ্গে গতিশীল হয়। ডালপালা ও পাথরের টুকরার উপর দিয়ে ঝোপ-ঝাড় ধ্বংস করে সে তার যাওয়ার চিহ্ন রেখে যায়। পথে সেরকম বিশেষ বাধার সম্মুখীন হলে সেটিকে এড়াবার জন্যে ঘুরে অবশেষে টানার প্রধান পথে পৌঁছায়।

টানার প্রধান পথে পৌঁছলে কাষ্ঠখণ্ডগুলি আর একবার আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়, যে পরীক্ষা সেগুলিকে কাটার স্থানে করা সম্ভব ছিল না। দোষত্রুটিগুলি দূর করা হয় কেটে-ছেঁটে, খুব বেশি দোষ থাকলে পুরো খণ্ডটিতেই বাতিল করে দেওয়া হয়।

কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে পরীক্ষা করা হয়ে গেলে আবার হাতিদের কাজ শুরু হয়। প্রতিটি হাতি প্রায় আধ-মাইল এক একটি খণ্ডকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের শৃংখলমুক্ত করে ফিরিয়ে এনে আবার অন্য খণ্ড টানতে নিযুক্ত করা হয়। এইভাবে আধ-মাইল টানা ও

আধ-মাইল এমনি এসে পুনরায় টানার কাজ করিয়ে দেখা গেছে যে এতে হাতিরা কম পরিশ্রান্ত হয়।

একদিন কোম্পানির এক সর্দারের এলাকা পরিদর্শন করতে আমরা গেলাম। জো সারা সকাল বেশ বাধ্যভাবে আমাদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু সর্দারের আস্তানার কাছাকাছি আসতে সে এক সময় ছিটকে বেরিয়ে গেল। সে কোথায় আছে তা তার উত্তেজিত চিৎকারে টের পাই। মনে করলাম সে তার চিরদিনের শত্রু বৃক্ষে অবস্থিত বাঁদরদের নিজস্ব ভাষায় গালাগালি করছে। কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হয়ে টের পেলাম একটি হাতির সঙ্গে সে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। জোর যে কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব সেটা বোঝা গেল ওই দৈত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায়।

সর্দার ব্যাপারটা এক পলক দেখে নিয়েই নিজের আস্তানায় যায় বর্শা আনতে ও লোকজন ডাকতে। সামান্য কুকুরের আস্পর্ধায় হাতি যদি ক্ষেপে যায় সেই ভয়ে আমাদের সঙ্গের কিছু ভীতু কুলি আবক করা গতিতে উঁচু গাছের ডালে উঠে পড়ল।

আমাদের শংকিত হওয়ার কারণ হচ্ছে জোর প্রতিপক্ষ হচ্ছে বু-বুন-চু, আমাদের হস্তিযুথের এক ভয়ংকর সদস্য। সামনের পা দুটিতে শেকল বাঁধা অবস্থায় সে শান্ত মনে সর্দারের আস্তানার কাছে চরে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় 'রণং দেহি' বলে নির্বোধের আহ্বান তাকে রোষান্বিত করে তোলে।

হাতির শুঁড়ের বাড়ি খেয়ে বা পিছনের পায়ের লথি খেয়ে নিজের দেহ চ্যাপটা করার মত স্থানে জো কখনও থাকে না। তাছাড়া সে সব সময় কামড়াবার ভান করে, সত্যি করে কিন্তু কামড়ায় না। জোর রণকৌশল হচ্ছে হাতিকে একবার এদিক থেকে, আবার ওদিক থেকে বেষ্টন করে ঘোরা, পুনঃ পুনঃ চুর পদাঘাতগুলি শত্রুর অস্তিত্ববিহীন স্থানে পড়ে ব্যর্থ হয়। হাতি সামনের শৃঙ্খলবদ্ধ পা

শুঁড়টি মাটি থেকে শূন্যে তুলে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুকে শুঁড় দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করার চেষ্টা করে চলে।

আস্তানার লোকের যখন বর্শা ও কয়েকটা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন দাঁতাল প্রাণীটি 'আলেয়ার মতো বিভ্রান্তকারী' শত্রুকে কাবু করতে না পেরে রাগে গর্জাচ্ছে। বিরাট দেহে বর্শার কয়েকটা জোর খোঁচা খেয়ে হাতি রণে ভঙ্গ দিল। কোন পক্ষেরই পরাজয় হয় নি এটা মনে মনে মেনে নিয়ে সে শান্তভাবে আবার আহারে মনোনিবেশ করল।

কিন্তু জো অত তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হলো না। সে বর্শাধারীদের ও স্থান ত্যাগকারী হাতিটির পিছনে দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ড লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে। ফলে অবস্থা আবার জটিল হয়ে উঠল। অন্যেরা লড়াইয়ে আগ্রহী না হলেও সে তাদের ঘিরে ঘুরতে থাকে। বু-বুন-চু ভীষণ বিরক্ত হয়। এই ব্যাপারে সে নির্দোষ হলেও বর্শার খোঁচা তারই দেহে ক্রমাগত পড়ে। সে তীক্ষ্ণ নিনাদে বড় গজদন্ত দিয়ে মাটি উপড়ে জানিয়ে দেয় যে সে এইবার ক্ষেপে যেতে পারে। আমি সর্দারকে বলি বর্শার খোঁচা কুকুরটাকে মারতে কিংবা জ্বলন্ত মশালের দ্বারা তাকে নরকের আগুনের আভাষ একটু দিতে। আমার নির্দেশ মতো নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টিতে ঘটনার পরিসমাপ্তি হলো।

জো আমাদের কাছে শান্তভাবে ফিরে এল মুখে চোখে এমন এক ভাব ফুটিয়ে, যাতে মনে হয় সে বোকামি করলেও এক মজার কাণ্ড করেছে। তার পাঁজরে বেল্ট দিয়ে পুরস্কার প্রদান করতে তার মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হলো, আমরা তার মর্যাদা হানি করছি এমন এক ভাব সে ফুটিয়ে তুলল।

দৈহিক শাস্তি তাকে কোন সময়েই বেশি বিচলিত করে না। বুল টেরিয়ারের মনিবরা জানে যে এই জাতের সব মেয়েদের মধুর আকর্ষণ-শক্তির জন্যে তাদের উপর রাগ ভুলে অপরাধ ক্ষমা করতে হয়।

যত বছর সে আমার কাছে ছিল, তার মধ্যে এই একবারই সে ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি হাতির পিছনে লেগে তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল।

শীতকালে জঙ্গলের মধ্যে কাজ করা বাস্তবিকই আনন্দদায়ক। বাতাসে তুষার পাতের সামান্য আভাস থাকলে বেশ কয়েকটা পুলওভার চাপিয়ে সকালে ক্যাম্প থেকে কাজে বেরোন হতো। তারপর কাজ করতে করতে শরীর গরম হয়ে উঠলে একটি একটি করে সেগুলি খুলে ফেলতাম। মধ্যদিনের চমৎকার উজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্যে যখন ক্যাম্পে ফেরা হতো, তখন পাচক যত অখাদ্যই রন্ধন করুক না কেন পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সে সব গ্রহণ করা চলতো, কারণ মেজাজ তখন এত প্রফুল্ল থাকতো যে সারা দুনিয়ায় মন্দ কিছু আছে বলে মনে হতো না। তিন মাসকাল চমৎকার আবহাওয়া এখানে থাকতো।

জুন মাসের শুরুতে বাক্স ভরা টাকা ও ওষুধপত্র নিয়ে কুলি ও ভৃত্যদের বিরাট বাহিনীসহ আমি চিয়েংমাই থেকে বাসে করে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করলাম অন্য জঙ্গলে নতুন কর্মক্ষেত্র স্থাপন করার জন্যে।

পথের বর্ণনা একটি শব্দে দেওয়া যেতে পারে—বিশ্রী। এ পথে ধীরভাবে যাওয়া চলে না। অসমান পথের উপর সমানে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আমাদের যেতে হয়। গাড়ির গতি কমালে স্টিয়ারিং ঠিক রাখা দেয়, আর গাড়ির কাঁপুনিতে দেহ কেন দাঁত পর্যন্ত ব্যথা হয়ে যায়।

মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আমরা চোমটোং পৌঁছালাম। এটি পথিপার্শ্বে এক ছোট গ্রাম, যেখানে ড্রাইভার বরাবর বিলম্বিত প্রাতরাশের জন্যে যাত্রা বিরতি করে। আমি যখন কফি খাই তখন ড্রাইভার মাংস আর কাঁচা লংকা দিয়ে এক ভাতের পাহাড়কে ধ্বংস করে ফেলল।

চোমটোং ছাড়ার একটু পরেই ড্রাইভারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গাড়িটা রাস্তার এক পাশে কাৎ হয়ে পড়ল। গাড়ির বিদ্রোহের কারণস্বরূপ আবিষ্কার করা গেল সামনের চাকাটি অগণিত পেরেক-বিদ্ধ হয়েছে। যীশু অন্যদের পাপমুক্ত করার জন্যে পেরেক নিজের দেহে গ্রহণ করেছিলেন, আর আমরা অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলাম ওইভাবে!

গরমকালে কাঠ বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস তীব্রবেগে ধূলির ঝড় উড়িয়ে এই ছোট গ্রামগুলির রাস্তা দিয়ে যেত। সেই ধূলির মেঘ এখানকার বাতাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসে থাকে। গাড়ির চাকার বেগে ছোট ছোট পাথর পথের উপর থেকে উল্কাপিণ্ডের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতো। অনেক গ্রামবাসী ওই সজোরে ধাবিত পাথরে আহত হয়েছে। বাসের মালিকদের কাছে তারা অনেক প্রতিবাদ জানিয়ে বিফল হয়েছিল।

তাই প্রতিকার কল্পে গ্রামবাসীরা বাঁশের উপর সার সার পেরেক পুঁতে উদার হস্তে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। যাতায়াতকারী গাড়িগুলির চাকায় প্রচুর পাংচার হওয়ায় গাড়ির মালিকরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে। তারা গ্রামের কাছে আস্তে গাড়ি চালায় এবং গ্রামবাসীরাও আর পেরেকের ফাঁদ পাতে না।

কিন্তু কিছু 'অবিস্ফোরিত মাইন' এখনও এখানে-ওখানে অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে এবং তারই একটি আমাদের গাড়িকে অচল করল! শুনেছি গ্রামবাসী ও বাস মালিকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের বেশ কয়েক মাস পরেও ওই অঞ্চলে টায়ার ফাটা বিরল ঘটনা ছিল না।

পরদিন দুপুরে লক্ষ্যস্থল নতুন জঙ্গলের নিম্নসীমায় আমরা পৌঁছোলাম। যাত্রা বিরতি ঘটিয়ে হুয়া-ওম পের তীরে এক ভুট্টার বাগানের পাশে আমরা ক্যাম্প করি। হুয়া-ওম-পে অর্থাৎ 'ছাগলের খাঁড়ি' এলাকা পরে ভাল করে পরিদর্শন করে বুঝলাম যে এর বড়

বড় জলপ্রপাতের জন্যে একমাত্র পাহাড়ী ছাগল ছাড়া আর কারও পক্ষে এটি উপযুক্ত বাসস্থান হতে পারে না। বৈশিষ্ট্যবিহীন জঙ্গলে ছিল বহু ছোট খাঁড়ি, যেগুলি মি-পিং নদীতে গিয়ে পড়েছিল।

এই স্থানে আমার বাসকালের শেষ পর্যায়ে আমার বিশ্বস্ত কুকুর জোর প্রায় শেষ দশা আমায় দেখতে হচ্ছিল। জো তার স্বভাব অনুযায়ী দুঃসাহস বা নির্বুদ্ধিতার জন্যে একটি গ্রাম্য মহিষকে আক্রমণ করে বসেছিল তার নিজের রাজ্যেই,—অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত গভীর পাঁকের মধ্যে।

যদিও লড়াইয়ের সময় জোর অবস্থা হয়েছিল মধুর মধ্যে আটকে যাওয়া মাছির মতো। হাত পা ইচ্ছেমত নাড়তে অক্ষম হলেও তার রোস কিন্তু বিন্দুমাত্র কমে না। মোষটি চরম বিরক্তির সঙ্গে টের পেল কাদা-মাখা কালো একটা কুকুর তার কানটা কামড়ে ধরেছে। গলা দিয়ে এক উৎকট শব্দ বের করে—এই ধরনের বৃহৎ প্রাণীদের গলা দিয়ে উৎকট গাঁ গাঁ ছাড়া অবশ্য অন্য বিশেষ শব্দ বের হয় না, —মোষটি লম্বা শিংয়ের এক ঝট্‌কা মারল। জো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পরে মোষটি তাকে একজোড়া শিং দিয়ে এমন গুঁতিয়ে দেয় যে জোর পাখা না থাকা সত্ত্বেও বেশ খানিকটা উড়ে গিয়ে কাদার মধ্যে চিৎপাত হয়ে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে জো তার রণহুংকার তখনও পরিত্যাগ করেনি।

জোর প্রতি যাতে আর নজর না দেয়, সেজন্য আমি ওই কাদার মধ্যে পড়ি-মরি করে ছুটে এসে হাতের বেড়াবার লাঠি দিয়ে মোষটিকে যত জোরে পারি খোঁচা মারি। সে আমার অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে আরও গভীর কর্দমের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। আমি মৃতপ্রায় জোকে নিয়ে ক্যাম্পে ফেরার সুযোগ পেলাম।

জোর পেটের নিচে শিংটা ঢুকে পাঁজরের পাশ ঘেঁষে কাঁধের হাড়ের উপরের চামড়া ফুটো করেছিল, তার দেহের প্রয়োজনীয়

অংশগুলি ক্ষতির হাত হতে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহের সুচিকিৎসা ও সযত্ন সেবার ফলে সে সুস্থ হয়ে উঠল। এই সময় তাকে কোথাও নিয়ে যেতে হলে ঝাঁপির মধ্যে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। যাহোক, সে সেরে উঠলে। ঐ ঘটনার স্মারক হিসেবে একটি ছ-ইঞ্চির ক্ষতচিহ্ন তার দেহে রয়ে গেল। কিন্তু আগের মতোই মোষদের পিছনে তাড়া করার স্বভাবটা তার গেল না। মনে হয় তার মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক বলে কোন বস্তু ছিল না, নইলে জীবনের অভিজ্ঞতা হতে কোন শিক্ষা সে গ্রহণ করতে পারে না কেন ?

নভেম্বর শীতের শুরুতে আমাদের কোম্পানী আমাকে নির্দেশ দিল কয়েক হাজার স্কোয়ার মাইল বিস্তৃত বিশাল মি-টুন বনাঞ্চল পরিদর্শন করে সামনের বছরে যেখানে কাজ শুরু করা চলতে পারে সেই স্থানগুলি নিরীক্ষণ করতে। এই সুন্দর বিরাট অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি হলাম। এই ভ্রমণে আমি একবারে বর্মা-সীমান্তের সন্নিকটে যেতে পারব এবং জনবিরল সেই স্থানগুলি পরিদর্শন করতে পারব। সেখানে করেন, লিস ও মুসের প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিগুলি বসবাস করে। এই উপজাতিগুলি সম্বন্ধে জানার তীব্র আগ্রহ আমার বরাবর ছিল।

আমার মালপত্র পরিবহনের জন্য তিনটি হাতিকে নির্বাচিত করা হলো, যাদের একটু বয়স হয়ে গেছে মি-পিংয়ের গভীর বালুকাময় ভূমিতে ভারী বোঝা টানার কাজের পক্ষে।

পু-তাও নামে প্রথম হাতিটি বিরাটাকার ও কর্মে উৎসাহী হলেও তার পরিশ্রমশক্তি রীতিমত হ্রাস পেয়েছে দীর্ঘকাল ওই কাঠ টানার কষ্টকর কাজ করার জন্যে। তাছাড়া তার বয়সও তিপান্ন বছর হয়েছে।

দ্বিতীয় হাতি পু-চিকে দৈত্যের মত দেখতে। কিন্তু তার শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রে কিছু গণ্ডগোল হওয়ার জন্যে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তখন কেৎলীতে গরম জল বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়

যেমন শোঁ শোঁ করে, তেমনি ফোঁস-ফোঁস করে তার নিশ্বাস পড়তো। তার বয়স বাষট্টি হয়েছিল, তাই খাটুনির বোঝাও একটু কমানো দরকার।

সর্বশেষে মি-মাংসের কথা বলা যাক্। সে এক বৃদ্ধ হস্তিনী, তার ঘূর্ণায়মান ছোট চোখগুলি জানিয়ে দেয় সে চিরকালের অবাধ্য পশু। তার শুঁড়ের ডগার কাছে একপাশে একটা বড় গর্ত ছিল। এরজন্যে তার কোন অসুবিধা হতো না এবং সে এটি ইচ্ছামত খুলতে বা বোঁজাতে পারত। এই দৈহিক ত্রুটি তার জন্মগত, না বাঘের কামড়ে হয়েছিল তা কেউ বলতে পারত না।

আমার জিনিসপত্র মি-পিং নদী পার করা হলো খেয়া-নৌকায়। সব মাল পার করার জন্য খেয়াটিকে কয়েকবার যাতায়াত করতে হলো। নৌকাটি নির্মিত হয়েছে একখণ্ড বড় সেগুন গাছের গুঁড়ি কুঁদে। এই গুঁড়িটি কোম্পানীরই গাছের প্রথমে ছিল, চোরেরা এটা চুরি করে খেয়া-নৌকা বানিয়েছিল। তাদের কাছ হতে এটা উদ্ধার করে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ কথা স্বীকার করতে হয় যে তারা চোর হলেও দক্ষ করিগর ছিল। বহু বছর আমরা তাদের বানানো এই সুন্দর নৌকাটি ব্যবহার ক'রছিলাম।

আধ মাইল চওড়া বর্ষার ঢল-নামা জলস্রোতে শীতে শীর্ণ হয়ে কয়েকটি গভীর খালের সৃষ্টি করেছে। এই খালগুলির মাঝে দ্বীপের মত বালুকাময় ভরা। খালগুলি আঁকাবাঁকা পথে মাইলখানেক গিয়ে নদীতে পড়েছে। নদীর অপর পাড়ে হাওদা পিঠে হাতিরা আমার অপেক্ষায় ছিল।

নৌকায় ঘোরাফেরার সুবিধা হবে বলে আমি জুতো জোড়া খুলে ফেলেছিলাম। জলে ভেজার হাত থেকে বুট ও মোজা বাঁচানোর জন্যে একটি কুলির হাতে সেগুলি আগেই ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি না পৌছানো পর্যন্ত কুলিটাকে ওপারে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম।

ওপারে পৌঁছে দেখি যে হাতিগুলির পিঠে মাল বোঝাই হয়ে যাওয়ায় তারা আগেই রওনা হয়ে গেছে এবং সেই মূর্খ কুলিটা আমার বুট-মোজা নিয়ে তাদের সঙ্গে চলে গেছে।

হাতির দলকে তাড়াতাড়ি ধরে নিতে পারবো ভেবে আমি খালি পায়েই হাঁটা শুরু করে দিলাম। আধ মাইলটাক যাওয়ার পর আমি হাতিদের দেখা পেলেও সেই কুলিটার দেখা পেলাম না। সে গাধা অন্যদের সঙ্গে আরও এগিয়ে গেছে।

আরও মাইলখানেক গিয়েও যখন তার চুলের টিকি দেখতে পেলাম না, তখন বাড়তি আর একটি কুলিকে হুকুম দিলাম দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আমার জিনিসটা নিয়ে অসেতে। সে খরগোসের মতো বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল বটে, ( মোজা বাদ দিয়ে ) শুধু বুট জোড়া নিয়ে।

বোকাদের ধমকালে ঘাবড়ে গিয়ে আরও বেশি কাজ ভণ্ডুল করে—এই সত্যটি স্মরণ রেখে আমি তাকে শুধু প্রশ্ন করলাম, 'মোজা জোড়া আনলে না কেন ?'

—'আপনি, হুজুর, মোজার কথা তো বলেন নি।' দাঁত বের করে হেসে সে আমাকে আমার উক্তি স্মরণ করবার চেষ্টা করল।

পথের পাথরে ক্ষতবিক্ষত পা যত জ্বালা করছিল তার চেয়ে বেশি জ্বালা মেজাজে বোধ করা সত্ত্বেও আমি নীরবে পায়ে জুতো গলিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি সেখানেই সেদিনের মতো যাত্রা-বিরতি ঘোষণা করে তাঁবু ফেলতাম। কিন্তু জায়গাটা জলহীন শুক্‌নো জঙ্গলের মধ্যিখানে বলে আমাকে আরও পাঁচ মাইল হেঁটে তাঁবু ফেলার উপযুক্ত জায়গায় পৌঁছাতে হলো।

সেখানে পৌঁছোবার কিছু আগে পায়ে এমন যন্ত্রণা হয় যে জুতো জোড়া খুলে আমি কুলিটার দিকে ছুঁড়ে মারি। রাগে হাত কাঁপার জন্যে সে দুটি তার গায়ে লাগে না। যাত্রা শুরু করার সময় আমি

যেমন নগ্নপদে ছিলাম, যাত্রা শেষ করার সময়ও তেমন নগ্নপদ হলাম।

টাকার মতো আকারের কয়েকটা ফোস্কার জন্যে আমাদের একদিন যাত্রা স্থগিত রাখতে হলো। পরদিন সে পথ ধরে আমরা রওনা হলাম, সেটি যুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যবাহিনী নির্মাণ করেছিল তাদের অধিকৃত শ্যামদেশ থেকে বর্মা অভিযানের জন্যে। বহু বৎসর আগে জাপানীদের উপস্থিতির সাক্ষীস্বরূপ একটি অগ্নিদগ্ধ মোটর গাড়ি পথে পড়ে থাকতে দেখলাম। রাস্তাটি এখনও বেশ ব্যবহার যোগ্য আছে। এই রাস্তায় পনেরো মাইল গিয়ে আমরা একটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়া রাস্তা ধরলাম, যেটি 'মিট' খাঁড়িকে অনুসরণ করেছে।

উচ্চ ঘাস ও পতিত বৃক্ষের জন্যে পথ চলা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। যখনই ঝোপ-জঙ্গলের জন্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখনই হাতিদের এগিয়ে দেওয়া হয় সব দলিত-মথিত করে সুগম করে দেবার জন্যে।

পথের বাধার জন্যে আমাদের গতি খুব মন্থর হয়। যাহোক, ক্রমশ আমরা উপরে উঠতে থাকি এবং ঘুর পথে উপ র ওঠার জন্যে ওই খাঁড়িটিকে দিনে বোধহয় বিশ বার আমাদের পার হতে হয়।

প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে খানিকটা জঙ্গল খুব তাড়াতাড়ি কোন রকমে পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা আস্তানা গাড়ি। সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত আমাদেব আস্তানাব প্রতিবেশীরা—পিঁপড়া, মশা, জংলি মাছি—আমাদের ভীষণ ব্যস্ত রাখতো গা-হাত-পা চুলকানোয়। রাতে ঠাণ্ডা বাতাস বইলে এবং আমাদের ক্যাম্প-ফায়ারের আগুন ও ধোঁয়া আত্মপ্রকাশ করলে তারা বিদায় নিত।

হাতিদের বয়সের কথা মনে রেখে আমরা ধীর গতিতে ভ্রমণ করি এবং ছ দিনে আমাদের গন্তব্য জঙ্গলের প্রান্তে পৌঁছোই।

'মি-ট' খাঁড়ির জলবিভাজিকা—যার পাশ দিয়ে আমরা ভ্রমণ

করছিলাম এবং সোমারে-লুয়াং নদী-যেটিকে এবার অনুসরণ করতে হবে—দুটিই এত শান্ত ও শীর্ণ, যে তাদের খুঁজে না পেয়ে অন্য পথে চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের যাত্রা পথের দিকে এক মৃদু জলস্রোত দেখে আমরা অনুমান করি মি-ট আমাদের পিছনে আছে এবং আমরা আমাদের জঙ্গলের সীমার মধ্যেই আছি।

এখন আমাদের অনুসন্ধান কার্য শুরু করা যেতেপারে। আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা কোথায় আছি তা নির্ধারণ করা। বন-বিভাগ থেকে আমাদের এই অরণ্য-অঞ্চলের এক স্কেচ-ম্যাপ ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। এই ম্যাপকে অনুসরণ করলে শুধু সময় নষ্ট নয়, মেজাজও নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ম্যাপের পথ অনুযায়ী ভ্রমণ করলে, সে পথটিই যে শুধু অস্তিত্বহীন তা নয়, পানীয় জল পাওয়া যাবে অস্তিত্ববিহীন নদী থেকে এবং পাহাড়ে চড়তে হবে ম্যাপে প্রদর্শিত সমতল ভূমিতে।

ম্যাপ শুধু ভুল নয়, ভয়ংকরও। বহুদিনের কষ্টকর ভ্রমণের ফলে ভুলগুলি সংশোধিত হয়ে এটা কোন রকম কাজ চালানো অবস্থায় আসে। মানচিত্র তৈরী করা নিঃসন্দেহে একটি কষ্টকর কাজ। কিন্তু এই ধরনের মানচিত্র নির্মাতা শুধু ভুল তথ্যের উপর নির্ভর করেনি, তার অসীম কল্পনাশক্তিকেও কাজে লাগিয়েছে।

এই ম্যাপ অনুসারে আমরা বনের বেশ কয়েক মাইল ভিতরে ঢুকে পড়েছি, যেখানে সেগুন-গাছ কাটা চলে না। অতএব আমরা স্থির করলাম আর একটু এগিয়ে সেগুন-বনের সীমায় তাঁবু ফেলব।

সোমারে-লুয়াং নদীর গতিপথের উপরিভাগে আমরা পৌঁছোলাম। স্থানটি বেশ মনোরম। নদী এখানে এক শীর্ণ জলধারা, এক গজের কিছু বেশি প্রশস্ত।

আমাদের উপস্থিতি কিছু কারেন তরুণীকে অবাক করে দিল। তারা নদীর পাড়ে ছোট জাল দিয়ে মুখরোচক চিংড়ি মাছ-

ধরছিল। তারা কারেন-কুমারীদের প্রথানুযায়ী পোষাক পরেছিল; সাদা লম্বা 'মাদার হাবার্ডস' তাদের পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলদার, এই পোষাকে দু-তিনটি লাল ফিতার বন্ধনী দেওয়া। তাদের কানের ফুটোয় ফুল গোঁজা, কিনারায় লাল এমব্রয়ডারি করা সাদা ঘোমটা মাথায় ও লাল টাসেলে চুল বাঁধা।

সামান্য কয়েক মাইল গেলেই তাদের গ্রাম। সেখান থেকে আমরা ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার শব্দ, মোরগের ডাক ও মনুষ্যবাসের বিভিন্ন ধ্বনি শুনতে পেলাম। চাল, মুরগি ও সব্জি কেনার উদ্দেশ্যে আমরা গ্রামের দিকে যাই।

গ্রামের যখন কাছাকাছি পৌঁচেছি তখন ঝোপের মধ্যে থেকে হঠাৎ এক বিরাট কালো শুয়োর বেরিয়ে আমাদের সামনের রাস্তা ধরে তীব্র বেগে গ্রামের দিকে দৌড়ল, সম্ভবত সেখানে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থলের উদ্দেশে।

আমার কর্মচারীটি আমার আগে আগে চলেছিল। সে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে আমার দোভাষীর কাজ করবে শুয়োরটি তাকে পথের বাধা স্বরূপ মনে করে শূকর-স্বভাব অনুযায়ী সেই বাধা অতিক্রম করা মনস্থ করে। সে বিন্দুমাত্র গতিবেগ না কমিয়ে কর্মচারীটির দু পায়ের মধ্যের ফাঁক দিয়ে দৌড়াতে চায়। এর ফলে কর্মচারীটি নিজেকে হঠাৎ শুয়োরের পিঠে আরোহী রূপে দেখতে পেল। শুয়োরটি তীব্র চিৎকার সহ বেশ কয়েক গজ তাকে বহন করার পর পিঠ থেকে ফেলে দেয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে যাওয়া ভূপতিত কর্মচারীটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বিনা ব্যয়ে বাহন পাওয়া সত্ত্বেও সে শুয়োরটিকে বিড়বিড় করে নিজস্ব ভাষায় কী গালি দিল কে জানে? অন্যকে শুয়োর বলাটাই গালিসূচক, কাজেই শুয়োরকে গাল দেবার জন্যে অন্য শব্দ খুঁজতে হবে।

কারেন গ্রামগুলির প্রতিরক্ষার প্রথম ব্যবস্থাটা দেখেছি এই শূকরের উপরই নির্ভরশীল। গ্রামের সীমানার জঙ্গলে শুয়োরের পাল চরে বেড়ায়। তারা ভয় পেলে সোজা গ্রামের মধ্যে ছুটে এসে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেয়। তাদের দেহের গঠনও ওই রকম বাঁকা শিরদাঁড়া সত্বেও তাদের দৌড়ের বেগ কিন্তু কম নয়।

গ্রামটি হচ্ছে নদীর কাছে এক উচ্চভূমিতে। গুটি দশেক বাড়ি গ্রামে আছে। ঢুকতে প্রতি বাড়ির দাওয়ায় কৌতূহলী কারেনরা বেরিয়ে আসে। আমি বহুকাল ধরে কারেনদের গ্রামগুলি যেমন দেখে আসছি এটাও ঠিক তেমনি। যে-কোন স্যানিটারি ইঞ্জিনীয়ার এই গ্রামগুলিকে অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করবে।

কারেনরা অপরিচ্ছন্নতা একবারে তাদের জাতীয় শিল্পের পর্যায়ে তুলেছে। গৃহের যত জঞ্জাল বাড়ির দাওয়ার ঠিক নিচে ফেলা হয়, যেখানে কুকুর ও শুয়োর আস্তানা গাড়ে। বাড়ির অন্দরে রান্নার জন্যে যে আগুন জ্বালা হয়, তার ধোঁয়া বেরোবার ব্যবস্থা না থাকায় ভেতরটা কালি-ঝুলে ভরা। বাড়িগুলির মাঝের জমি ঋতু অনুযায়ী হয় কাদায় ভরা নয় ধুলোয় ভরা, যেখানে পোষা মোষ ও শুয়োরের পাল মহানন্দে গড়াগড়ি যায়। গ্রামের বাসিন্দারা নিরক্ষর ও একটু রূঢ় প্রকৃতির হলেও তাদের স্বভাবজাত অমায়িক আচরণ ও গ্রাম্য সরলতা আমায় একবারে মুগ্ধ করে।

তাঁবুতে আমি যখন ম্যাপ নিয়ে হিমসিম খাই, তখন গ্রাম থেকে অনিসন্ধিৎসুর দল এসে হাজির হয়। আমার কাজকর্মের বারোটা বেজে যায়। মেয়ে পুরুষ ও শিশুরা মাটিতে বসে পরস্পরের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলে, তাঁবুর বিভিন্ন জিনিসের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে, একে অন্যকে খোঁচা মেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ উদাসীন আচরণ দলের সাহসীদের উৎসাহিত করে তোলে তাঁবুর জিনিসগুলি পরীক্ষা করে দেখতো যে জিনিসগুলি

তাদের কৌতূহল উদ্রেক করে, সেগুলি তারা নেড়ে-চেড়ে টেনে-টিপে দেখতে থাকে।

বহু জিনিসই তাদের বিস্মিত করে। তার মধ্যে ছোট রেডিও-সেটটা তাদের অবাক করে দেয়। বাঁশ খাটিয়ে রেডিওর এরিয়েল ঠিক করা তারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করল। তাদের বিদায় করার আগে আমার খেয়াল হলো তাদের একটু গান-বাজনার প্রোগ্রাম শুনিয়ে দেওয়া।

'গোলমালের বাক্স' থেকে প্রথম সুরের ধ্বনি জাগতেই তারা সকলেই মুহূর্তের মধ্যে অবাক বিস্ময়ে সম্মোহিত হয়ে গেল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত আড়ষ্ট ও নির্বাক হয়ে তারা দু ঘণ্টা বসে রইল, যতক্ষণ সঙ্গীত, সংবাদ ও নানা ধরনের সংলাপ ওই যন্ত্রটি হতে নির্গত হলো। তারপর তারা উঠে তাড়াতাড়ি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। গৃহের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে তারা নিশ্চয়ই এই 'ম্যাজিক-বাক্স' নিয়ে গভীর আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছিল।

জানুয়ারী মাস থেকে শুরু করে শুষ্ক ঋতুতে জঙ্গলভূমির শুকনো ডালপালার জঞ্জালে মাঝে মাঝে হঠাৎ আপনা থেকে আগুন লেগে যায়। এই দাবানল পুরানো মৃত ঝোপঝাড় দাহ করে বসন্ত ঋতুর জাতকদের আবাসস্থলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়। কোন কোন সময় এই দাবানল এমন বৃহৎ আকার ধারণ করে যে দূর থেকে অন্ধকার রাত্রে সেই দৃশ্য দেখলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হতে হয়।

এক অনুসন্ধান কার্যের সময় হুয়ে-লোয়ংয়ে আমার তাঁবু পড়েছিল এক শুকনো ঘাসের সমুদ্রের কিনারায়। এক নিচু পাহাড়ের উপর থেকে দাবানলের ধোঁয়া এই ঘাসগুলির প্রচণ্ড দহনশক্তি স্মরণ করিয়ে দিল।

আমাদের সহিসদের সর্দার বলল, 'ওটা একটা ছোট আগুন। এখান পর্যন্ত ও আগুন এসে পৌঁছোবে না।'

অবশ্য সতর্কতাস্বরূপ সে আমাদের ঘোড়াগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে শুকনো নদীগর্ভে বেঁধে রাখল।

পাহাড়ের গা বেয়ে আগুনকে নিচে নেমে আসতে দেখে ক্যাম্পের সবাই সচকিত হলো। আমাদের আস্তানার দিকে সেই সর্বনাশা আগুন এগিয়ে আসতে থাকে। সহিস-সর্দার কত বড় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা তা বুঝতে পারলাম।

তার পরের আধ ঘণ্টা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড হওয়ার বাস্তব আশংকার পটভূমিকায় অগ্নিনির্বাণ প্রচেষ্টা নামে যে প্রহসন অভিনীত হলো তা চিরস্মরণীয় সে প্রহসনে সবাই অভিনেতা, কিন্তু প্রত্যেকের ভূমিকা রচিত হলো তার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী। প্রত্যেকেই অপরকে চিৎকার করে হুকুম দেওযা শুরু করল, ফলে সুস্পষ্ট নির্দেশের বদলে হৈ-হট্টগোলই প্রাধান্য পেল এবং সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল যেন কতকগুলি হিস্টিরিয়ার রোগী সম্মিলিতভাবে পাগলামী শুরু করেছে।

আগুনের সঙ্গে সংগ্রামকারীরা সম্মুখ-সমরের জন্যে ঘাসের সমুদ্রের মধ্যে প্রায় দুশো গজ অগ্রসর হলো জলের বালতি হাতে আক্রমণের জন্যে। আগুনে জল পড়ে যে গরম জলীয় বাষ্প সৃষ্টি হলো, তার উত্তাপে কাবু হয়ে এবং আগুনের উত্তাপে মুখ চোখ ঝলসে যাওয়ায় সম্মুখ-সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে সৈনিকেরা পার্শ্বদেশ থেকে আক্রমণের রণকৌশল গ্রহণ করল। সেখানকার রণক্ষেত্রে জ্বলন্ত বা নিভন্ত কাঠকয়লার উপর নগ্নপদে নৃত্যে তারা যতটা শক্তি ও সময় ব্যয় করল, তার এক দশমাংশও শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যয়ে অক্ষম হলো। অবশ্য এর জন্যে তাদের আমি কোন দোষ দিই না। বেচারাদের সংগ্রামের সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না।

অগ্নিদেবের বিজয়-রথ আমার ক্যাম্পের অত্যন্ত কাছাকাছি অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে বুঝতে পেরে সেটি থামাবার জন্যে আমি রণকৌশলের কথা ভাবলাম। সকলকে ডেকে ক্যাম্পের কাছাকাছি ঘাসগুলিতে আগুন লাগাতে বলি এবং ক্যাম্পের চারপাশের জমির বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত ঘাসগুলি পুড়ে গেলে এই আগুন তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলতে বললাম।

প্রথম অগ্নিকাণ্ডকে রুখতে তারা যখন হিমসিম খাচ্ছে তখন এই দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ড শুরু করতে বলায় তারা মনে মনে আমায় পাগল ভাবল। যাহোক, তারা প্রতিবাদ না করে আমার কথা মতো কাজে নামল। আমি চাইছিলাম দাবানল এখানে এসে পৌঁছোবার আগেই তার বাহক ঘাসগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে, ফলে জ্বালাবার কিছু না পেয়ে আগুন নিজেই নিভে যাবে।

আগুন নেভাতে গিয়ে তারা যেমন অদ্ভুত কাণ্ড করছিল, আগুন জ্বালাতে গিয়েও তার চেয়ে কিছু কম করে না। একদল তো এমন আগুন জ্বালিয়ে বসল যে সেটি যেন ওই দাবনলেরই সহোদর ভ্রাতা, যারা সেটি জ্বালিয়েছে, তারা আর সেটিকে নেভাতে পারে না। তাদের সাহায্যের জন্যে অন্য দলকে ছুটে আসতে হলো। আর এক দল যে আগুন জ্বালালো সেটি ভাল করে জ্বালার আগেই অন্য একদল নিভিয়ে দিল। কোন মূর্খ দল ছাড়া হয়ে ক্যাম্পের একবারে এত কাছে আগুন জ্বালালো, যে তাঁবুগুলি আর একটু হলে পুড়ে যাচ্ছিল। জল ও বালি দিয়ে এই আগুন যারা নেভাতে এল, তারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে নদীগর্ভে দৌড়োল দেহের জ্বালা জুড়াতে।

ক্যাম্পগুলি ধোঁয়া ও ছাইয়ে ভরে যায়। ঘোড়াগুলি ভয়ে ক্ষেপে গিয়ে লাফালাফি করে। যাহোক, দাবানল উপযুক্ত ইন্ধন না পেয়ে আমাদের আস্তানা পর্যন্ত আর অগ্রসর হতে পারল না। কাছাকাছি যে দাহ্য পদার্থ ছিল, সেগুলি নিয়ন্ত্রিতভাবে পুড়িয়ে আগেই ভস্মে পরিণত করে রাখায় দাবানল অন্যদিকে চলে গেল। জঙ্গলের এই আগুন এক জায়গায় স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এর তেজ ও উত্তপ্ত উত্তাপ কিন্তু কম হয় না। অগ্নিনির্বাকদের অনেকের গায়েই এত ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল যে প্রাথমিক চিকিৎসায় আমাদের বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো।

মি-টুন জঙ্গলে গাছ কাটা স্থির হয়েছে এই সংবাদটাও দাবানলের

মতো এই অঞ্চলে এমন ছড়িয়ে পড়ল যে আমাদের অফিসে ভাবী ঠিকাদারদের ভিড় লেগে গেল। তাদের অঞ্চলটা পরিদর্শন করে এসে সর্বনিম্ন টেণ্ডার দিতে বলা হলো।

এপ্রিল ও মে মাসে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হলো এই কাজে দপ্তরের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি পালন করায়। ঠিকাদারদের সঙ্গে দরাদরিতেও বেশ কিছুটা সময় যায়। তারা পরিদর্শন কার্য সেরে এসে আমাদের জানাল যে কাজটা এত কষ্টকর যে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে, তবে তারা কোম্পানীর অনেক দিনের বন্ধু বলে লাভের আশা একবারে পরিত্যাগ করে এই টাকায় কাজটা করবে।

যে টাকার অংক তারা উল্লেখ করল তা আমাদের স্থিরীকৃত অংকের দ্বিগুণ। তাই এক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রাখার জন্যে আমরা সজোরে হেসে উঠি, যেন কোন বালকের অর্থহীন উক্তি শুনেছি। তারপর আমরা যে অংকটা উল্লেখ করলাম সেটা আমরা যা দিতে প্রস্তুত তার অর্ধেক। এবার হাসার পালা ঠিকাদারদের এবং তারা অফিস কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

দু পক্ষই বুঝল যে সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি হচ্ছে, তাই ধানাই-পানাই ছেড়ে সিরিয়াসলি কাজের কথায় আসি এবং শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষই খুশি মনে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। যদিও অনেক সময় আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে বেশি টাকা আদায় করা হয়। ভদ্রভাবে দ্ব্যর্থবোধক কথায় ভয় দেখানো হয়, যেমন হাতিদের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, গাছ কাটার সময় বিপদ আসতে পারে ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারি দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারী বা বিপদ-আনয়নকারীই আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এসেছে। এই জঙ্গলে আবার এক একজনের এক একটা প্রভাবাধীন এলাকা আছে, সেই এলাকায় কাজ করতে হলে তাকে বা তার পেটোয়া লোককে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। এমন কি কোম্পানীর কিছু ব্যয়বৃদ্ধি হলেও নির্বিঘ্নে ব্যবসা করার জন্যে অনেক সময় অনেক কিছুই আমাদের মেনে নিতে হয়।

ঠিকাদারদের সঙ্গে গাছ কাটার চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেলে জঙ্গলে যাত্রা করার আগে আমার শেষ কর্তব্য হচ্ছে প্রয়োজনীয় রসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ঠিক মতো সংগ্রহ করা, যাতে গাছ কাটার সারা সিজনে কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়। পানীয় জল ছাড়া প্রায় সব কিছুই বেঁধে-ছেদে হাতি ও ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে জঙ্গলের অভ্যন্তরে পঁয়তাল্লিশ মাইলেরও বেশি যেতে হবে সেগুন বৃক্ষের এলাকায় পৌঁছোবার জন্যে। বর্ষা নেমে গেলে ঘোড়ারা আর ওই পথে যেতে পারবে না।

জিসিসপত্রের তালিকা এত বেড়ে যায় যে দেখে আমার মাথা ঘুরতে থাকে। কাঠ টানার শেকল, কাঠ বাঁধার শেকল, হাতি বাঁধার শেকল, কুড়াল ও করাত কুড়ির হিসেবে, জঙ্গলের ছুরি শয়ের হিসাবে, গাঁইতি, শাবল, দুশো পাউণ্ড ওজনের এক নেহাই, হাপর, শান দেওয়ার পাথর, কোদাল, বেলচা, তার, দড়ি, লোহার বড় রান্নার পাত্রসমূহ এবং বহু টুকিটাকি জিনিস। এছাড়া পঞ্চাশ টন চাল, বাক্স ভর্তি টিনড্-ফিশ, কফি, কনডেনসড মিল্ক, প্রণ-শস, শুটকি মাছ, একশো গ্যালন রান্নার তেল ও প্রায় সমপরিমাণ কেরাসিন তেল, বস্তা বস্তা চিনি। এইসব থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় কালির বোতল, লেখার কাগজ, ছুঁচ-সুতো ইত্যাদি।

আমার নিজস্ব কিছু মালপত্র এর সঙ্গে আছে। কয়েক বাক্স টিনের খাদ্য ও শতখানেক জ্যান্ত মুরগীও সেই তালিকায় আছে। তারপর আছে কুলিদের জন্যে ওষুধপত্র,—পেনিসিলিন ও সালফারড্রাগস প্রচুর, ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনাইন, বেরি-বেরির জন্য কন্সেন্ট্রেটেড ভিটামিন বড়ি, অ্যাসপিরিনের বড়ি—এসব হাজারের হিসাবে। এর সঙ্গে গ্যালন-গ্যালন বীজাণুনাশক ডিসইনফেকট্যান্ট ও গজ-গজ ব্যাণ্ডেজ।

মানুষদের জন্যে ওষুধের সঙ্গে হাতিদের জন্যে ওষুধের কথাও ভাবতে হয়। আর্সেনিক ও স্ট্রিকনিন টনিক পিল ও জোলাপের বড়ি

এত নিতে হয় যে এক ছোট শহরের সব অধিবাসীকে মেরে ফেলা বা মলত্যাগ করানো স্বচ্ছন্দে চলে। ক্ষতের মলম, চোখের গণ্ডগোলের জন্যে বোরাক্স ও ক্যাস্টর-অয়েল। হাতির দেহে ছাপ দেবার জন্যে ফস্‌ফোরিক-অ্যাসিড পেস্ট, এটি খুব সাবধানে প্যাক করতে হয়, কেউ ভুল করে খেয়ে ফেললে অত্যন্ত যন্ত্রণা পেয়ে মরবে।

সর্বশেষে হাতিদের জন্যে মুখরোচক বস্তু—আধ টন তেঁতুল ও সম-পরিমাণ নুন। তালিকানুযায়ী সব সংগ্রহ করে আমি তিন মাস বনবাসের জন্য প্রস্তুত হলাম।

মে মাসের শেষের দিকে আমরা যখন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম, তখনও আমাদের হাতিরা দু সপ্তাহের দূরের পথে অবস্থিত রেস্ট-ক্যাম্পে রয়েছে। তাই গোটা পঞ্চাশ টাট্টু ঘোড়া আমাদের ভাড়া করতে হলো। এর মধ্যে অর্ধেক ঘোড়া আমাকে ও লোকজনদের বহন করবে, বাকি অর্ধেক ওই পর্বত প্রমাণ মালপত্রের বোঝা বইবে। আমাদের অফিস ইতিমধ্যেই এক গুদামঘরে পরিণত হয়েছে। মি-পিং নদীর অপর পারে ঘোড়াদের পিঠে মালপত্র বোঝাই করা হবে স্থির হওয়ায় নৌকায় করে মালপত্র পার করা হলো এবং ঘোড়ারা সাঁতরে নদী পার হলো।

যাত্রার প্রথম দিন সকালেই আমরা এক গণ্ডগোলের মধ্যে পড়লাম। রাহেং শহর তখনও আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়নি এমন এক জায়গায় আমরা একদল উত্তেজিত গরুর-গাড়ির গাড়োয়ানদের সাক্ষাৎ পেলাম। তারা আগের দিন সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছে রাত্রি যাপনের জন্যে গাড়ির থেকে জন্তুগুলিকে খুলে দিয়েছিল। পরদিন ভোরে তাদের রাহেং রওনা হওয়ার কথা। কিন্তু ভোরের আগেই এক অভাবনীয় ঘটনায় তারা উঠে পড়তে বাধ্য হয়। একটি বাঘ এসে তাদের একটি বলদকে মেরে তুলে নিয়ে চলে গেছে।

অন্য বলদগুলি নিদারুণ ভয়ে খোঁটার বাঁধন ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন দিকে পালিয়ে গেছে। গাড়োয়ানদের মধ্যে যারা একটু সাহসী, তারা বাঘের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য কয়েকটি সেকেলে গাদা বন্দুকে কম্পিত হস্তে বারুদ ভরে এবং পরস্পরের কাজে নিজের নিজের বীরত্বের বড়াই করে নিজেকেই সাহস দেয়। তাদের মধ্যে যারা ভীরু, তারা পলাতক বলদগুলিকে আগে ধরে আনার প্রস্তাব তোলে। কিন্তু বাঘ-শিকারীরা তাদের ভোটে হারিয়ে আগে বাঘ শিকারে যাবার প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। তাদের ভোটে জয়ী হবার প্রধাণ কারণ মানুষের একটি স্বাভাবিক দুর্বলতা, নিজের ভীরুতা কেউ প্রকাশ করতে চায় না। যা হোক, আমরা তাদের ব্যাঘ্র-শিকারে সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজেদের পথে অগ্রসর হলাম।

আমাদের ঘোড়াগুলি সম্ভবতঃ তাদের সহজাত বুদ্ধি দ্বারা কাছাকাছি বাঘের উপস্থিতি টের পেয়ে সারাদিন ছটফট করতে থাকি। তাদের মধ্যে থেকে দশটি ঘোড়া প্রথম রাতে আমরা যেখানে তাঁবু ফেললাম, সেখান থেকে বাঁধন ছিঁড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। পরদিন বেলা দুপুর পর্যন্ত সহিষরা তাদের খুঁজে পায় না। কোন অভিযান শুরু করার প্রথম দিকে চিরকালের প্রথানুযায়ী এইসব ছোটখাট বাধা আমার মনে অক্ষম রাগের সৃষ্টি করে।

তিনদিন পরে আমাদের জঙ্গল-হেড কোয়ার্টার্সে পৌঁছলাম। পৌঁছে দেখি আমাদের কুটীরের ছাদ তখনও তৈরি হয়নি। কুটীর ছাওয়ার উপযোগী বস্তুর সন্ধানে আমাদের মিস্ত্রির দল বনের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। যাহোক, কিছু চেঁচামেচি করতে প্রথম বর্ষণের আগেই তারা ঘর ছেয়ে দিল।

খবর এল যে হাতিদের এসে পৌঁছোতে আরও কয়েকদিন লাগবে। তাদের জন্যে প্রতীক্ষা কালটা কাটে মালপত্রগুলি মিলিয়ে ও পরীক্ষা করে দেখতে। প্রত্যাবর্তনকারী অশ্ববাহিনীকে প্রয়োজনীয় নতুন জিনিসপত্র নিয়ে আসতে বলা হলো।

একদিন সন্ধ্যায় নিচে নদীর কাছ থেকে হাতির দলের গলার মধুর ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল। নবাগতদের স্বাগতম জানাতে সবাই এগিয়ে এল।

একশো মাইল পথ হেঁটে এলেও তাদের বিশ্রাম-কাল যে ভাল কেটেছে এবং তারা যে খোশ্-মেজাজে আছে, এটা বোঝা গেল তাদের অনবরত শুঁড় নাড়া, পা ঠোকা ও গায়ের চামড়ার তলায় তোষকের মতো পুরু চর্বির স্তর দেখে।

পরদিন সব জন্তুদের পরীক্ষা করে দেখা হলো এবং তাদের 'লগবুকে' আর একটি ওয়ার্কিং-সিজন শুরু করার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লেখা হলো।

সর্দারদের গাছ কাটার এক একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। তারা নিজেদের আস্তানা ও চিহ্ন দেওয়া গাছগুলি খুঁজে নিতে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা ঘুরে এসে জানাল যে থাকার ও গাছ কাটার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে, এবার তাদের 'দিল-খুশ' রাখার জন্যে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হবে। ওয়ার্কিং-সিজন সফল করে তোলার জন্যে এই টাকা দিয়ে তারা মদ কিনল।

আরও এক সপ্তাহ কেটে যায় তাদের মদ খেয়ে 'দিল-খুশ' করে হৈ-হুল্লায়। তারপরে তাদের কানে কাজের কথা তোলা হয়।

কয়েক মাস নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটানোর ফলে তারা কাজের কথায় বিশেষ গা করে না। বিরক্তিকর কাজে লাগার চেয়ে অমনি আলস্যে দিন কাটানোতেই তারা বেশি আগ্রহী। প্রতি বছরের মতোই বাক্-বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে তাদের কাজে নামাতে হলো।

হাতিরাও জঙ্গলে স্বাধীনভাবে এতদিন কাটানোর পরে মাহুতদের সহজে ঘাড়ে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে হাজির হতে আপত্তি জানায়। ফলে সব কিছুতেই দেরী হয়, এমন কি তাদের সকালে স্নান করিয়ে পিঠে হাওদা চাপানোর কাজেও। দীর্ঘ বিশ্রামের ফলে তাদের বুকের ও পিঠের চামড়া নরম শিথিল হয়ে গেছে। তাই তাদের প্রথমে হাল্কা

কাজ দেওয়া হয় গায়ে ফোস্কা পড়ার ভয়ে। কিন্তু এই হাল্কা কাজেও তাদের অনেকে অরাজি হয়।

কুলিরা পেটে মদ ও মনে অবাধ্যতা নিয়ে ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজের মধ্যে নেমে পড়ার পরে ক্রমশ তাদের কাজের মেজাজ এসে যায়।

তারপর ঘন ঘন গাছ পড়ার প্রচণ্ড শব্দে আমি বুঝতে পারি সবকিছু ঠিক মত চলছে। আমাদের কাজের সাথী হাতির দলকেও দেখি এগিয়ে চলেছে বিরাট গাছের গুঁড়ি টানতে টানতে।
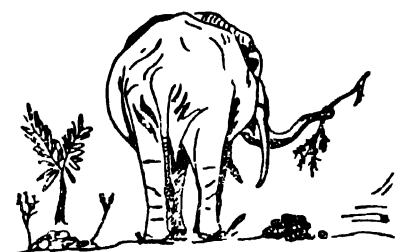
# কাজের সাথী হাতি

## (Elephant)

[ ১৯৫০ সালে এক যুবক এইচ. এন. মার্শাল ব্রিটেন থেকে শ্যামদেশে গিয়েছিলেন সেগুন কাঠের ব্যবসা করার জন্যে। গভীর জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা। হাতি যে ক. পরিমাণ প্রয়োজনীয়, তাব বিশদ বিববণেব সঙ্গে যুবকটিব অভিজ্ঞতা ও অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনাও এই বচনায় করা হয়েছে। ]

গভীর জঙ্গলের সেগুন গাছ কেটে চালান দেওয়ার ব্যবসায় যোগ দিয়ে আমাকে প্রথমেই যা শিখতে হয়েছিল, তা হচ্ছে হাতিদের আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, মেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ, তাদেব খাওয়ানো, স্নান করানো, চিকিৎসা শুশ্রূষা ইত্যাদি। সাত বছর হাতিদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাদের যে কর্মক্ষমতা, ভালমানুষী বদমাইসি লক্ষ্য করেছি, তারই কিছুটা এখানে পাঠকদের অবগতির জন্যে লিখছি।

বর্তমানকালে জঙ্গলের জীবিত প্রাণীদের মধ্যে হাতিই হচ্ছে আকারে বৃহত্তম। তার এই বৃহৎ আকার ও অদ্ভুত আকৃতি পশুরাজ্যে তাকে এক বিশিষ্ট স্থান দান করেছে। আফ্রিকার হাতিদের তুলনায় ভারতীয় হাতিরা একটু খর্বাকার।

হাতিরা ছায়ায় থাকতে ভালবাসে। এরা সারা দিন ও রাতের বেশ কিছুটা অংশ চরে বেড়াতে ভালবাসে সেই রকম বনভূমিতে যেখানে তাদের মনোমত আহার্য পাওয়া যাবে। কাছাকাছি যদি বড় জলাশয় ও শীতল কর্দমাক্ত স্থান থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই!

রাতে মাত্র সামান্য কয়েক ঘণ্টা এরা ঘুমোয়, সাধারণতঃ ভোর রাতের দিকেই, তাও আবার যদি তাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি ও

শ্রবণশক্তি তাদের নিশ্চিন্ততা দান করে বাঘের আক্রমণের বিপদ থেকে।

এরা সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধ হয়ে বাস করে। যূথপতির নেতৃত্বে এরা এক বিচরণভূমি থেকে অন্য বিচরণভূমিতে যায়। এদের দলের নেতৃত্ব প্রায়ই পুরুষের বদলে নারীর উপর ন্যস্ত থাকে এবং বলাবাহুল্য সেই স্ত্রী-হস্তি রীতিমত বুদ্ধিমান ও বয়সে বৃদ্ধা হয়। হস্তি-শাবকদের রক্ষার ভার যৌথ দায়িত্বে দলের সকলের উপর থাকে।

স্বাধীন বন্য হাতিদের কথাই উপরে লিখলাম। ধরা-পড়া হাতিদের আচার-ব্যবহারের অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়, বিশেষ করে বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে। যে হাতিদের দিয়ে কাজ করানো হয় তাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক খুব কমই থাকে, কারণ বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের ধরে আনা হয়। বাচ্চা হাতিকে রক্ষা করা সম্পর্কে দাঁতাল পুরুষ হাতিদের কোন দায়িত্ব থাকে না। বাঘের আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দৃষ্টি রাখে বাচ্চার মা আর কোন 'মাসী' থাকে, শাবক ভূমিষ্ঠ হবার কিছুকাল আগে থেকেই পিতামাতার কাছাকাছি রাখা হয়।

কাজের জন্য হাতির দল গঠন করতে গেলে হয় বয়স্ক শিক্ষিত পশু কিনতে হবে, নয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বাচ্চা হাতিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, অথবা বয়স্ক বন্য পশু ধরে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। শেষ পদ্ধতিটা শ্যামদেশে খুব প্রচলিত নয়। এখানে কোম্পানীর হাতির দল গঠিত হয় প্রথম দুটি ধরনের হাতিদের নিয়ে।

হাতিদের লিঙ্গ নির্ণয় করা খুবই সহজ। সাধারণতঃ দাঁতাল হাতি হচ্ছে পুরুষ এবং গজদন্তহীনরা হচ্ছে স্ত্রী। অনেক সময় পুরুষদের একটি মাত্র গজদন্ত নিয়ে জন্মাতে দেখা গেছে, কখনো সম্পূর্ণ দন্তবিহীন অবস্থাতেও। সেক্ষেত্রে দাঁতের অভাব শুঁড়কে পূরণ করতে দেখা গেছে।

একটি পূর্ণ বয়স্ক দাঁতাল হাতির কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা সাত ফুট ন' ইঞ্চি থেকে ন' ফুট পর্যন্ত হয়। দেহে শ্লেটের মত ধূসর বর্ণের ত্বকে কালো শক্ত লোম ইতস্তত গজায়। তিন থেকে চার টনের মধ্যে এদের ওজন। এদের বিরাট দেহের জন্যে এদের নিঃসন্দেহে অরণ্যের সম্রাট বলে মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

হাতিকে দিয়ে বাস্তবিকই বিরাট কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং সেই কাজে প্রায় অকল্পনীয় শক্তির প্রয়োজন হয়। এর দেহের বিরাট ওজন ও মাংসপেশীর প্রচণ্ড ক্ষমতা যে কী পরিমাণ কাজে লাগে তা বোঝা যায়, যখন সে মাথা দিয়ে ঠেলা মারে কিংবা শিকলে বাঁধা বোঝা টানে। বোঝার ওজন পাঁচ টন হলেও হাতি স্বচ্ছন্দে তা টানতে পারে। অনেক সময় পাহাড়ী নদীর তীব্র স্রোতের মধ্যেও সে তার অসাধারণ কর্মশক্তির পরিচয় দেয়।

কিন্তু ভারবাহী পশু হিসাবে হাতি খুব উচ্চ স্তরের জীব নয়। নিজের ওজনের এক দশমাংশ মাত্র সে পিঠে বইতে পারে। সে তুলনায় একটি ঘোড়া নিজের ওজনের অর্ধেক সারাদিন পিঠে বইতে পারে এবং হাতির দ্বিগুণ বেগে দ্বিগুণ দূরত্বে যেতে পারে। বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু একটা বয়স্ক হাতি ছটা স্থানীয় ছোট টাট্টু-ঘোড়ার সমান ক্ষমতা রাখে।

জঙ্গলের মধ্যে যেখানে গমনাগমনের কোন পথ নেই, সেখানে গাছপালা ভেঙে হাতি অন্যদের যাবার পথ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। খুব খাড়া পাহাড় ছাড়া সর্বত্র সে গমন করতে পারে। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে থেকে টন টন কাঠের বোঝা টানার কাজে হাতির সঙ্গে কারও তুলনা করা যায় না। আজ পর্যন্ত মাল বহনের জন্য যত রকমের মেসিন নির্মিত হয়েছে, তাদের চেয়ে হাতি এই কাজে বেশি উপযুক্ত। হাতি না থাকলে শাল-সেগুনের ব্যবসাই বোধহয় করা যেত না।

জঙ্গলে গাছ কাটার জন্যে যখন আমরা মালপত্তর ও লোকজন

নিয়ে রওনা হই, তখন হাতির পিঠে মাল তোলার আগে তার উঁচু শিরদাঁড়া তাঁবুর নরম ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। যে বস্তুর ধারগুলি তীক্ষ্ণ, সেগুলিকে হাতির দেহের দুপাশে এমন ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তার শিরদাঁড়ায় আঘাত না লাগে।

সব বোঝা ও হাওদা শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেলে মাহুতরা যার যার নিজের হাতির উপর উঠে তার কানের পিছনে সজোরে 'খালি পায়ের লাথি লাগায়'। এই 'খালি পায়ের লাথি লাগানো' ব্যাপারটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগলেও বিরাটাকার প্রাণীটির কাছে এ হচ্ছে মৃদু আদর করার নামান্তর।

এই আদর খাওয়ার পরে হাতিরা হেলে-দুলে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মানুষের চেয়ে অনেক ধীর গতিতে তারা চলে।

[illegible] এই কাজে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাই বর্ণনা করি।

গাছপালা ভেঙে হাতির দল যে পথ তৈরি করে চলে, সেই পথে কুলির দল বয়ে নিয়ে চলে আমাদের প্রয়োজনীয় যত ভঙ্গুর জিনিস-পত্তর, যেমন লণ্ঠন, বাঁশের ঝাঁপি ভরা কাঁচের বাসন ইত্যাদি।

চার ঘণ্টায় দশ মাইল যাওয়ার পর আমাদের ম্যানেজার নদীর পাড়ে এক বাঁশবনের কাছে সেদিনের মতো যাত্রা বিরতির আদেশ দিলেন। পরদিন পর্যন্ত আমাদের যেখানে ক্যাম্প ক[illegible] হবে।

জঙ্গল-ভ্রমণে অনভ্যস্ত আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ব সেই ভয়ে যে এই বিরতি নয় তা আমি প্রথমেই বুঝলাম। ম্যানেজার বিরতির আদেশ দিয়েছিলেন হাতিদের কথা ভেবেই। একদিনের পক্ষে তারা যথেষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

জঙ্গলে কাঠ-কাটা ব্যবসার প্রথম ও প্রধান নিয়মটি আমার জানা হলো। সেটি হচ্ছে—হাতিদের স্বাস্থ্য, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কর্মক্ষমতা, শ্রান্তি-ক্লান্তির কথাই সর্বদা বিবেচ্য এবং এই বিষয়টি অন্য সব বিষয়ের উপরে।

যাত্রা সেদিনের মতো স্থগিত হওয়ায় হাতিদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় এবং সেই আনন্দ তারা প্রকাশ করে উচ্চস্বরে নিনাদ করে। পথশ্রমে তাদের দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তারা শুঁড়ে করে মুখ থেকে থুথু নিয়ে পিঠে-পেটে ও দেহের দুপাশে ছিটিয়েছিল শরীরটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য।

ক্যাম্প থেকে একটু দূরে তাদের বিশ্রাম স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল শিক্ষা দ্বারা অভ্যাসের ফলে তারা ক্যাম্পের কাছাকাছি মলমূত্র ত্যাগ করে স্থানটিকে নোংরা করে না।

শেষ রাতে আগে আলো ফোটার আগেই আমাদের তাঁবুর কাছের ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে একটি হ্যারিকেন-আলো এগিয়ে এল। মশারীর মধ্যেই চা পরিবেশিত হলো এবং আমিও এক চুমুকে চায়ের কাপ নিঃশেষ করলাম। তারপর তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে হাফ্-প্যান্ট ও বুশ-জ্যাকেট পরলাম। পায়ে যখন জুতো গলাই, তখনই কুলিরা আমার তাঁবু গুটিয়ে ফেলে যতদূর পারা যায় ছোট বাণ্ডিল করে বহনের উপযুক্ত করে নিয়েছে।

অন্ধকারের মধ্যে শিকলের মৃদু ঝনঝনানি শুনে বুঝলাম হাতিরা এসে গেছে। তাদের মাহুতদের উপস্থিতি টের পাই মাটি থেকে দশ ফুট উপরে শুধু জ্বলন্ত সিগারেটের আভা দেখে।

তারপর ক্যাম্পের কাছাকাছি গভীর জলাশয়ে জলের ছপ্ছপ্ শব্দ শুনতে পেলাম। মাহুতরা 'সেপ' ( বসে পড় ) হুকুম উচ্চ থেকে উচ্চতর স্বরে বার বার সেইসব হাতিদের দেয়, যারা এই শীতের সকালে ঠাণ্ডা জলে নামতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে না।

অবশেষে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক সব হাতিগুলিকে জলের মধ্যে উপবেশন করানো হয়। ভোরের আবছা আলোয় দেখা যায় যে ছায়ামূর্তির মতো মাহুতরা হাতির পিঠের উপর বসে গাছের পাতা দিয়ে তাদের গা রগড়ে সাফ করে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে কোন হাতি দুষ্টুমি করে জলের মধ্যে তার সমস্ত শরীরটা ডুবিয়ে দিয়ে শুধু শুঁড়ের ডগাটি উঁচু করে রাখে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে। তার মাহুত ওদিকে রাগে ক্ষেপে ওঠে, কারণ হাতির সঙ্গে তারও প্রাতঃস্নান হয়ে যায় (অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতার জন্যে মাহুতের স্নানের প্রয়োজনও নেহাৎ কম নয়)। এই রকম দুষ্টুমির জন্য মাহুত তার অধীন প্রাণীটিকে প্রাণভরে গালাগাল দিয়ে ও মেরে শায়েস্তা করার চেষ্টা করে।

প্রতিটি হাতির পিঠ থেকে ধূলো-ময়লা একবারে তুলে ফেলার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। পিঠে নোংরা লেগে থাকলে ভারী হাওদার ঘসড়ানিতে চামড়া ছিঁড়ে গেলে সেখানে ঘা হয়ে যেতে পারে।

অবশেষে হাতির দল সিক্তদেহে জল ছেড়ে ওঠে। স্নানশেষে তাদের গায়ের চামড়া কালো ভেলভেটের মতো চক্‌চক করে। এবার তাদের পিঠে হাওদা বসানো হবে।

গাছের নরম ছাল সারারাত হাওয়ায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই ছাল সমান করে নিয়ে হাতির পিঠে প্রথমে গদির মতো বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর হাতিকে আর একবার হাঁটু গেড়ে বসানো হয়। দুটি লোক ভারী হাওদা বয়ে এনে হাতির পিছনের দিকে ছড়ানো পায়ের উপর উঠে ওই কাঠের দোলনার মতো বস্তুটি ঠিক মতো পিঠের সেই গদির উপর বসিয়ে দেয়।

তারপর হাতি মাহুতকে ঘাড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। হাতি দাঁড়াবার সময় মাহুতের কাজ হচ্ছে হাওদাটিকে ধরে থাকা, যাতে গড়িয়ে না পড়ে যায়। হাওদা দড়ি দিয়ে হাতির পিঠে ভাল করে বাঁধা হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাইয়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই রাতের আস্থানা আমরা সদলে ত্যাগ করতে সক্ষম হই।

দিনের যাত্রাশেষে সন্ধ্যায় তাঁবু ফেলার পর আমাদের ব্যবসা-সংক্রান্ত আর এক ধরনের কাজ শুরু হয়।

কুলির দলের এক এক সর্দার তার 'ক্যাম্প-বুক' নিয়ে আসে আমাদের পরীক্ষার জন্যে। তার দায়িত্বে যে সাজ-সরঞ্জাম মালপত্র ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে তারই সম্পূর্ণ তালিকা এই ক্যাম্প-বুকে লেখা থাকে। তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য আমরা তাদের রাতের ডেরা পরিদর্শন করি। পরীক্ষার সুবিধার জন্যে তারা তাদের হেপাজতের দ্রব্যগুলিকে ডেরার সামনে ভূমিতে বিছিয়ে রাখে। ভারী মোটা লোহার চেন গাছের কাটা গুঁড়ি টানার জন্যে, লম্বা সরু চেন বাঁধন দেওয়ার জন্যে, তাঁবু ও তাঁবু খাটাবার সরঞ্জামাদি, কুড়াল, করাত, গাঁইত, শাবল, তারের বাণ্ডিল, বালতি, রান্নার হাঁড়ি-কড়া এবং দরকারী আরও বহু জিনিস সব ক্যাম্প-বুকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় এবং কোন নতুন জিনিস দরকার হলে সেটা দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নেওয়া হয়।

সকালে ম্যানেজার সকলকে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। তাঁবুর বাইরে টেবিলে বসে তিনি তালিকা দেখেন কাকে কত দিতে হবে। তাঁর সামনে থাকে রসিদের বই ও স্ট্যাম্প প্যাড। এক স্টিলের ক্যাশ-বাক্সে থাকে সুন্দরভাবে সাজানো নোটের তাড়া। আমি খাজাঞ্চী ও রসিদ গ্রহীতার কাজে সাহায্য করি।

প্রত্যেক সর্দার বয়স অনুসারে তার অধীন ব্যক্তিদের টেবিলের কাছে নিয়ে আসে। অন্যেরা বিনীতভাবে মাটিতে বসে তাদের পালা আসার জন্য প্রতীক্ষা করে। যে লোকটির মাইনে বাড়াবার দরকার সর্দার তার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রশংসা করে এবং যাকে তাড়াবার দরকার তার সম্বন্ধে সক্রোধে নিন্দা করে। নিজের দলের লোক সম্বন্ধে সর্দারের এই মন্তব্য করার অধিকার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মেনে নেওয়া হয়।

টাকা গ্রহণকারী ব্যক্তিটি টেবিলের কাছে এসে বাঁ হাতের বুড়ো

আঙুলের ছাপ রসিদে দেয়। টাকা নিয়ে সে কিন্তু তখনি গোনে না, হয় গুণতে জানে না, নয় অবসর সময়ে গুণে দেখবে।

নতুন জায়গায় আস্তানা গাড়ার প্রথম দিনের বিবরণ দিলাম। তার পরের দিনের প্রধান কাজ হলো হাতিদের পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা।

আমাদের সংস্থার পঁয়ত্রিটা হাতি মেফ্যাং নদীর পাড়ে ও জলে তাদের কর্মহীন অবসর সময়টা কাটাচ্ছিল। বিকালে ও সন্ধ্যায় তাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি এনে 'বিগ-প্যারেড'-এর জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়।

পরদিন খুব ভোরে হাতির দলের ঘোরাফেরার পাঁচমিশেলী শব্দ তাঁবুর মধ্যে থেকে শুনতে পেলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম আমাদের হাতির দলটিকে স্নানের নিয়ম অনুযায়ী নদীর কাছে বিভিন্ন জলাশয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবারের স্নান খুব ভাল করে ও দীর্ঘকাল ধরে করানো হয়, যাতে প্রতিটি হাতি পরিদর্শনের জন্যে একবারে ফিট্‌ফাট অবস্থায় উপস্থিত হয়।

তাদের পায়ের নখ ও দাঁত ঘষে পালিশ করা হয়, যতক্ষণ না চক্‌চক্ করে। লেজের লোম ভালভাবে আঁচড়ানো হয়। তারপর প্রাণীটিকে ছায়াঘেরা তৃণাচ্ছন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে প্রতীক্ষায় রাখা হয় পরিদর্শনের।

কোন মাহুতই তার হাতির পিছনে সাবান ও জল নিয়ে পরিশ্রম করার পর তার প্রিয় প্রাণীটিকে ধুলো-বালির মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাইবে না, কারণ হাতির মাথায় হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি জাগলে সে শুঁড়ে করে কিছু ধুলো-বালি তুলে নিজের মাথায় ও পিঠে ছিটিয়ে আনন্দ পেতে পারে। তখন ওই নোংরা ভূতকে নিয়ে পরিদর্শনের জন্যে হাজির হলে মাহুত তার সহকর্মী অন্যান্য মাহুতদের কাছে রীতিমত উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়াবে।

ম্যানেজার পরিদর্শনে এসে বড়-সর্দার তার 'হাতিদের খাতা' নিয়ে

তাঁকে সাহায্য করে। প্রতিটি হাতির জন্য একটি করে আলাদা খাতা, যাতে সেই হাতির যাবতীয় বিবরণ লেখা আছে, যেমন—নাম, সংখ্যা ও বয়স, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য, হেলথ-রিপোর্ট, রোগ থাকলে তার বিবরণ ও চিকিৎসার বিবরণ; কী কাজ এই হাতি করে, হাতির বিশদ বিবরণ—লিঙ্গ, উচ্চতা, ওজন, প্রতি পায়ের আঙুলের সংখ্যা, দাঁতাল হাতি হলে দাঁতের দৈর্ঘ্য, কানের আকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ, চোখের বিবরণ, লেজের দৈর্ঘ্য।পিঠের আকৃতি, গাত্রচর্মের বিবরণ। এইসব তথ্য এইজন্য রাখা হয় যে, প্রয়োজন হলে হাজারটি হাতির মধ্যে থেকেও সেই হাতিটিকে খুঁজে বের করা যাবে।

প্যারেডে দাঁড়ানো হাতিদের মধ্যে প্রথম হাতিটিকে এগিয়ে আনা হলো। সেটি এক হস্তিনী। মাহুত তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে। মাহুতকে মনে হলো বেশ ভদ্র ও রসিক, কারণ নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সে নিজের টুপিটা খুলে হাতির গোলাকার মাথায় রেখেছে। টুপির এই রকম ব্যবহার নবাগত আমার চোখে অদ্ভুত হাস্যকর লাগে।

হাতিটি আমাদের এত কাছে চলে আসে, যে আমার ভয় হয় আমরা তার পদতলে পিষ্ট হয়ে যাব। একবারে প্রায় ঘাড়ের উপর এসে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের দূরত্ব এত কম যে আমি তার ক্ষুদে চোখের শুধু সাদা অংশটাই দেখতে পাই না, সেই অংশের শিরাগুলি পর্যন্ত গুণে দেখতে পারি।

দৈত্যাকার জানোয়ারের এই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অন্যদের কাছে দেখলাম খুবই সাধারণ ব্যাপার। নবাগত আমি বুঝলাম অন্যদের কাছে এটি নিত্যক্রিয়া বলে তারা বিচলিত হয় না। মনে মনে ভয় পেলেও উদাসীন থাকার শিক্ষা আমি গ্রহণ করলাম।

ম্যানেজার তার পরিদর্শন তথা পর্যবেক্ষণ কাজ শুরু করে দিলেন। মাঝে মাঝে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে মন্তব্য ও মাহুতদের মাতৃভাষার সংলাপ অনুবাদ করে আমায় শোনালেন।

চোখগুলি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হলো জঙ্গলের ভাঙা ডালপালার কোন খোঁচা লেগেছে কিনা, যার ফলে আংশিক দৃষ্টিহীনতা না হয়ে থাকে। পায়ের নখ পর্যবেক্ষণ করা হলো, পাহাড়ী পথে অত্যাধিক ভ্রমণের ফলে নখ ভেঙে গেছে কিনা দেখার জন্যে। বুক ও পিঠে বিশেষ নজর দেওয়া হয়, সেখানে শুকনো গরম দাগ থাকলে বোঝা যাবে বোঝা টানার শেকল ঠিক মতো না লাগানোর ফলে ঘর্ষণে ফোড়া হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছে কিনা।

পরের হাতিটি ছিল এক দাঁতাল বিরাট পুরুষ-হাতি। এর সঙ্গে বর্শা হাতে এক সতর্ক পাহারাদারও ছিল। সে হাতি ও আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাতের বর্শা হাতির চোখের সামনে নাচাল। তার কার্যের অর্থ হচ্ছে হাতিকে সাবধান করে দেওয়া এবং আমাদের সাহস যোগানো।

ম্যানেজার ও তাঁর সঙ্গীরা আমাদের দলের এই মাননীয় ও মেজাজী প্রাণী পু-বুন-চুকে যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে একটু দূরেই দাঁড় করাল।

এই হাতিটিকে দেখতে বেশ সুন্দর, প্রকাণ্ড গোলাকার মস্তক, ফিকে হলুদ রংয়ের বিরাট গজদন্ত প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ, পশ্চাতের পদদ্বয় হ্রস্ব ও শক্তিশালী। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গই প্রচণ্ড শক্তির আভাস দেয় এবং এই দৈহিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন এক অনিশ্চিত মেজাজ, যে তার উপর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখার দরকার যখনই তার কাছাকাছি মানুষজন থাকে। একমাত্র গাঁজা-আফিমের নেশাখোর বা গণ্ডমূর্খ ছাড়া পু-বুন-চুকে তাচ্ছিল্য করার সাহস কারও নেই। এই ধরনের ব্যক্তিদের কেউ কেউ ভুল করার জন্য চরম মূল্য দিয়েছিল।

ম্যানেজার বলেছিলেন, 'আমাদের সবচেয়ে ভয়ংকর জানোয়ার, সবচেয়ে ভালকর্মী। এমন ভাল হাতি আপনি আর দেখতে পাবেন না।'

তাঁর কথা শুধু সত্যি নয়, একেবারে তিন-সত্যি!

আমি সব সময় দেখেছি যে বন্য প্রাণীদের বুদ্ধি ও শক্তিকে ঠিক মতো যদি কোন কাজের মধ্যে আনতে পারা যায়, তাহলে তারা চমৎকার কর্মী হয়ে ওঠে। পাকা মাহুত যদি বড় গাছের গুঁড়ি টানার কাজে হাতিকে ঠিক মতো লাগাতে পারে, তাহলে বিরাট ভারী কাষ্ঠখণ্ডকে প্রচণ্ড জেদে বশবর্তী হয়ে টেনে সকলকে অবাক করে দেবে।

ম্যানেজারের পরীক্ষায় পু-বুন-চু একবারে প্রথম বিভাগে পাশ করল এবং তার বহুদিনের কারেন মাহুত উচ্চ প্রশংসা লাভ করল।

তারপর আর একটি হস্তিনী পরীক্ষার জন্যে উপস্থিত। এই বৃদ্ধা হস্তিনীর বহুকাল ধরে বহু দরকারী কাজ বিনা আপত্তিতে করার রেকর্ড রয়েছে। তার জীবনের অবশিষ্ট কাল যাতে হাল্কা কাজে কাটে সেই ব্যবস্থা করা হলো।

তারপর এল আর এক দাঁতাল হাতি, নাম হচ্ছে, পু-কাম সিয়েন (তার নামের অর্থ হচ্ছে একদন্তী সোনার সংগ্রামী। হাতিদের নামকরণের সময় স্ত্রী হাতিদের বেলায় পু বা পা অর্থাৎ পিতা শব্দ যোগ করা হয়।)

সে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতি বটে, কিন্তু কম বিদ্রোহী নয়। আমাদের আর একটি নাম করা হাতি মি-নুলার মতো তারও কানের লতিতে দুল পরাবার মতো একটা ফুটো করে একটা লোহার শেকল বরাবর ঝুলিয়ে রাখা হয়। অবস্থা বিশেষে এই শেকল একটা হুকের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়, নৌকোর নোঙরের মতো বাঁধনে সে বাঁধা থাকে।

যখন সে ভয় পেয়ে বা কোন কারণে উত্তেজিত হয়, তখন এত জোরে মাথা নাড়ে যে তার মাহুত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে বেশ কিছুটা দূরে পাথরের রাশি বা বাঁশঝাড়ের মধ্যে দুম করে ছিটকে পড়ে। বেচারা মাহুতের বরাত ভাল থাকলে নরম মাটিতে পড়ে কম চোট পায়।

হাউইয়ের বেগে হাতির পিঠ থেকে শূন্যে ওঠার আগে মাহুতের শেষ কর্তব্যটি হচ্ছে ওই নোঙর সমেত শেকলটা হাতির পিঠ থেকে নিচে ফেলে দেওয়া, যাতে বিদ্রোহী হাতি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাবার সময় ওই শেকলের হুকটা লম্বমান কোন কিছুতে আটকে গিয়ে চলমান যানে ব্রেক কষার মতোই হঠাৎ হাতির গতিরুদ্ধ করে দেয়।

এই কৌশলটি ঠিক মতো প্রয়োগ করতে না পারলে বেশ কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের আগে স্বাধীন প্রাণীটিকে পুনরায় অধীন করতে পারা যাবে না এবং ইতিমধ্যে সে প্রায় নিজের ওজনের সমান ফসল গ্রামবাসীদের ক্ষেত থেকে ভক্ষণ করে ফেলবে।

প্যারোড পু-কাম-সিয়েনের পর স্থান ছিল মি-মুলার। আমাদের হাতির দলের সবচেয়ে দুষ্টু আর কুখ্যাত হচ্ছে এই হস্তিনীটি। আমাদের রেকর্ডে দলের সকলের চেয়ে তার অপরাধের তালিকাটি দীর্ঘ। দস্যুতা করে গ্রামবাসীদের ক্ষেতের শস্য নষ্ট করার জন্য আমাদের বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। তার আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা হচ্ছে যে পিঠের হাওদা প্রায়ই নিকটবর্তী গাছে ধাক্কা লাগিয়ে চুরমার করতে সে সক্ষম। শেকল ছিঁড়ে ফেলে বেশ কিছুদিনের জন্যে অদৃশ্য হওয়ার অলৌকিক শক্তিও সে অর্জন করেছে।

কাছাকাছি ঘোড়াদের উপস্থিতি তাকে পাগল করে তোলে। হয়তো ঘোড়াদের সম্বন্ধে তার মনে একটা হিংসার ভাব আছে। হাতিদের তুলনায় ঘোড়াদের হাল্কা কাজ করতে দেখে সেও বদমাইসী করে কোন ভারী কাজ করতে চায় না। হাতিদের বুদ্ধি আছে বলে শুনেছি, কিন্তু সেটা যদি এই ধরনের বদবুদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে বেশ মুস্কিল হয়।

তার ছোট গোল চোখ দুটি সে চারদিকে ঘুরিয়ে এমনভাবে তাকায় যে তার কখনও পুরুষ-সঙ্গীর অভাব হয় না। অবশ্য তার

সঙ্গীরাও তার ছলাকলা চাতুরীতে বেশ বিরক্ত হয়ে যায়। মি-মুলকে প্রথম দর্শনের বেশ কয়েক বছর বাদে আমি দেখেছিলাম পো-টেম নামে একটা হাতি, খুব সম্ভব তার চাতুরীতে বিরক্ত হয়ে, দাঁতে করে ঠেলতে ঠেলতে তাকে জঙ্গলের এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। চতুষ্পদদের মধ্যে তাকে আমার সবচেয়ে অসামাজিক জীব বলে মনে হয়েছিল। মাহুতরা তার পিঠে চড়ার চেয়ে কাজে ইস্তাফা দেওয়া পছন্দ করত। বছরের পর বছর সে আমায় জ্বালিয়ে খেয়েছিল।

তারপর এল পু-ফিয়াং। ছোট সুন্দর জীব হলে কী হবে, তার এক মহা বদ্ অভ্যাস ছিল সব সময় গা-দোলানা। এই গা-দোলানির জন্য সে মাহুতদের কাছে খুবই অপ্রিয়। হাতির দলের অন্যদের যে কোন বদমাইসীর চেয়ে এই গা-দোলানি মাহুতরা বেশি অপছন্দ করত। কারণ এই দোলানি সহ্য করে কোন মানুষ তার পিঠে বেশিক্ষণ থাকতে পারত না। প্রচণ্ড ঝাকুনির ফলে স্কন্ধদেশ হতে উৎক্ষিপ্ত ব্যক্তি শূন্যপথে পরিভ্রমণের সময় অনুমান করতে পারত না যে তার ধরাপৃষ্ঠ অবতরণ করবে নরম বালুকারাশির বিছানায় অথবা ছুঁচালো বাঁশের ডগায়।

অবশেষে এক বুড়ো সর্দারের দলভুক্ত শেষ হাতি—পু-সিডা-চুম-সি। গজদন্তহীন চুম সি তার শক্তিশালী প্রকাণ্ড শুঁড় অনবরত নাড়ায় আর গোটায়। তার কর্মতালিকার রেকর্ড খুব চমৎকার, যদিও তার উঁচু ঢেউ খেলানো পিঠটায় হাওদা বসানো আমাদের কাছে সব সময়েই সমস্যার ব্যাপার ছিল।

এই দলভুক্ত হাতিদের স্বাস্থ্যে কোন খুঁত পাওয়া গেল না, যা বুড়ো সর্দারের কাছে খুবই গর্বের বিষয়। বুড়ো সর্দার তার দলবল নিয়ে সরে যেতে পরবর্তী সর্দার সামনে এগিয়ে এল। দুপুরের লাঞ্চ পর্যন্ত হাতিদের এই পরীক্ষার কাজ চলে।

লাঞ্চের পরে আমরা ছোট একটা হাতির দলকে নিয়ে পড়লাম।

আমাদের সংস্থার ছাপ দিয়ে এদের চিহ্নিত করতে হবে। এরা হারিয়ে গেলে বা অন্য দলে মিশে গেলে যাতে খুঁজে পেতে সুবিধা হয় তার জন্যই এই কাজ।

প্রথমে হাতিকে এনে এমনভাবে দাঁড় করানো হয়, যাতে এর পাছায় আমরা ছাপটা দিতে পারি। তারপর লেজে একটা শক্ত দড়ি বেঁধে সেটাকে পেটের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘাড়ের উপরে বসা মাহুতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাহুত সেই দড়িটা শক্ত করে টেনে ধরে থাকে, ফলে হাতি লেজ নেড়ে ছাপ দেওয়ার কাজে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না।

ছাপ দেওয়া হয় ফস্‌ফোরিক অ্যাসিডের ধূসর-হলুদ বর্ণের পেস্ট দিয়ে। একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে এটা দেহে লাগানো হয়। লাগাবার সময় সর্বাগ্রে যে সতর্কতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তা হচ্ছে হঠাৎ লেজের ঝাপ্টায় হাতি যেন না এই পেস্ট ছড়িয়ে দেয়, তার কাছে দাঁড়িয়ে যারা কাজ করছে তাদের কারও চোখে কোনক্রমে এই পেস্ট লাগলে একবারে অন্ধ হয়ে যাবে।

ছাপটা ঠিক মতো আঁকা হয়ে গেলে হাতিকে নিয়ে গিয়ে মিনিট কুড়ির জন্যে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এই সময়ে অ্যাসিডের ক্রিয়া যত পাকা হয়ে ওঠে, ততই ওই ছাপ দেওয়া স্থানটির জ্বলুনি দূর করতে হাতি ওখানে লেজ বুলাবার জন্যে ছটফট করে। কিন্তু কিছুতেই তাকে ওখানে লেজ বুলাতে দেওয়া হয় না।

কুড়ি মিনিট পেরিয়ে গেলে তাকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানটি জল দিয়ে ধুইয়ে দেবার জন্যে। তার মাথাটা জল থেকে উঁচু করে রাখা হয়, যাতে না ওই ক্ষতিকারক ফস্‌ফোরাস অ্যাসিডের জল তার চোখে লাগে। ছাপের জায়গাটা ভাল করে ধোয়া হয়ে গেলে ওখানে মলম লাগিয়ে দেওয়া হয়, মলমের জন্য মাছি ওখানে বসে তাকে বিরক্ত করে না। ইতিমধ্যেই হাতির পিঙ্গল-কৃষ্ণবর্ণের ত্বকে ছাপটা লাল হয়ে ফুটে ওঠে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পুরানো

ছাল উঠে গেলে হলুদবর্ণের ছাপটি দেহে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

জেলের দাগী কয়েদীর মতো হাতিকেও দাগী করার পর আসে তাদের গজদন্ত-ছেদনপর্ব।

কোন হাতির গজ-দাঁত খুব বেশি বড় হলে সেটিকে মাপ মতো কেটে ফেলা হয়। হাতিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আনা হয় আগে থেকে নির্বাচিত একটি গাছের কাছে। তার কপালটা সেই গাছে এমনভাব ঠেকানো হয় যে গাছের গুঁড়ির দু পাশে দাঁত দুটি থাকে। বলাবাহুল্য গাছটি খুব বড় নয় বলে তার গুঁড়ির বেড়ের দুপাশে দাঁত দুটি রাখা সম্ভব হয়। হাতিকে খুব শক্ত করে বাধা হয় এই অবস্থায়, ফলে দাঁতের আগায় করাত চালাবার সময় গাছের গুঁড়ির বাধার জন্যে হাতি শুঁড় দিয়ে তাকে মারাত্মক আঘাত করতে পারে না।

এই বিশেষ হাতিটির দাঁত এমন লম্বা যে কাঠের গুঁড়ি তোলার সময় দাঁতে চাপ পড়ে, তাই দাঁতের আগা থেকে ইঞ্চি ছয়েক কাটার দরকার হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গজদন্তের অর্ধাংশ পর্যন্ত নার্ভ-সিস্টেম কার্যকর ও অনুভূতিসম্পন্ন, আর বাকি অর্ধাংশের সঙ্গে নার্ভের সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ আমাদের নখের মতো সেই অংশ কাটলে কোন যন্ত্রণাবোধ হয় না। গজদন্তের উপরে আমাদের দাঁতের মতো কোন এনামেল না থাকলেও আসলে এটি দাঁতই।

যে পর্যন্ত গজদন্তের 'মৃত' বা অসাড় অংশে এই কর্তন সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু করাতের দাঁত যদি একবার হাতির দাঁতের 'জীবন্ত অংশ' বা সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলির উপর পড়ে তাহলেই প্রলয়-কাণ্ড ঘটে। তখন পৃথিবীর কোন মাহুতই তার অঙ্কুশ দিয়ে হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। যন্ত্রণা ও রাগে সে একেবারে ক্ষেপে ওঠে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাই সর্দার হাতির দাঁতে বেশ করে চর্বি মাখিয়ে দেয় সহজে করাত চালাবার জন্যে। তার সহকারী হাতিকে অন্যমনস্ক করে রাখার জন্যে জীবটির প্রিয় খাদ্যবস্তু তাকে প্রদান করে। এই প্রিয় খাদ্যবস্তুটি হচ্ছে নুন মাখানো তেঁতুলের গোলা ও নারকোলের শাঁস। হাতিকে খেতে দিয়ে ভুলিয়ে রাখার এই কৌশল দেখলাম বেশ কার্যকর হলো। সর্দার নির্বিঘ্নে করাত চালিয়ে কাজ শেষ করল।

হাতির দাঁত বিনা বাধায় অপারেশান করা হলো। হাতিটির দুটি দাঁতই এখন আর ছুঁচাল রইল না, আগাটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। শল্য-চিকিৎসার এক আদিম বন্য সংস্করণ আমার দেখা হলো, যেখানে চিকিৎসকের রোগীটি হচ্ছে সাড়ে তিন টন ওজনের এক ভয়ংকর জীব!

পরদিন সকালেও এক হৈ-হৈ কাণ্ড প্রত্যক্ষ করলাম—হাতিদের টিকা দেওয়া!

আমরা হাতিদের কাছে আসার আগেই মাহুতরা তাদের স্নান করিয়ে এনে আমাদের আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। আমি শুনলাম টিকা বা ইন্‌জেক্‌সনের কার্যটি নির্বিঘ্নে সমাপন করতে হ .। কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। তার মধ্যে সবপ্রধান হচ্ছে যে হাতি কয়েকটিকে তখন টিকা বা ইন্‌জেক্‌শান দেওয়া হবে, সে কটি ছাড়া বাকি সমস্ত জন্তুদের ওই অপারেশানের স্থান থেকে একশো গজ বা তারও বেশি দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ দেহে ছুঁচ ফোটাবার সময় যদি সেই প্রাণীটি ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে দেয়, তাহলে সেখানে উপস্থিত জন্তু মাত্রই বিচলিত হবে, সমস্ত জন্তুর দল নয়।

ভীতি হচ্ছে খুব সংক্রামক মনোভাব। একজনের ভয় অন্য সকলের মধ্যে সংক্রামিত হলে তখন তাদের সামলানো অসম্ভব হবে।

প্রত্যেক ছোট দলের মধ্যে আবার আগে পুরুষ-হাতিদের টিকা দেওয়ার কাজটা সেরে ফেলা ভাল, তাদের স্বাভাবিক অনাসক্তভাব তাদের চেয়ে ভীরু স্ত্রী-হাতিদের মনে সাহস এনে দেবে। যদি কয়েকটি ভীরু হস্তিনী নিয়ে প্রথমে টিকা দেওয়ার কাজ শুরু করা যায় এবং তারা ঘাবড়ে গিয়ে একবার অসহযোগিতার মনোভাব অবলম্বন করে, সমস্ত দলটার মধ্যে নিশ্চয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

এই বিষয়গুলিকে যথাযথ মনে রেখে কাজ শুরু করা হলো। প্রথমে যে দাঁতাল হাতিটিকে সামনে এগিয়ে আনা হলো তার মাথায় একরাশ নীল ফুলের মালা জড়ানো এবং মাহুতেরও ছাঁদা করা দু কানে ওই ফুল গোঁজা।

আমাদের 'আউটডোর-সার্জারি' বিভাগের কাজ শুরুর আগে 'পেসেন্ট'-এর সামনের পা দুটি এক গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হলো। ম্যানেজারের ফোল্ডিং অপারেটিং টেবিলের উপর বিছানো পরিষ্কার চাদরের উপর রাখা থাকে ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জ, কয়েক ডজন চকচকে ছুঁচ, ফুটন্ত গরম জলের পাত্র, স্টেরিলাইজিং বেলি, এবং এক ফ্লাস্ক ভর্তি গুঁড়ো বরফেব মধ্যে রাখা অ্যান্টি-অ্যান্থারাক্স সিরাম। ডিসপেনসিং টেবিলে থাকে বোরাসিক পাউডার, পাঁচ গ্রেনের আর্সেনিক-স্ট্রিকনিন বড়ি, স্টকহোম-টার, লোরেক্সিন মলম, সালফা-পাউডার, লিণ্ট এবং ডাক্তারীর অন্যান্য দ্রব্য।

ডাক্তারের সহকারীরূপে এখন আমার কাজ হচ্ছে ছুঁচগুলিকে স্টেরিলাইজ করা এবং দু শিশি সিরাম দিয়ে সিরিঞ্জগুলি ভরে দেওয়া। দু শিশি সিরাম মাত্রা হিসাবে খুব সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু সেইসময় এটা কিছুটা পরীক্ষামূলক স্তরেই ছিল।

হাতির মতো রবারের ন্যায় চামড়াওয়ালা জীবের দেহে ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জের ছুঁচ বিদ্ধ করার সময় যদি সে হঠাৎ একটু নড়াচড়া করে ওঠে· তাহলে ছুঁচ ভেঙে তার দেহেই ঢুকে থাকার কিংবা সিরিঞ্জের ব্যারেল ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। তাই প্রথমে শুধু

ছুঁচটি তার দেহে বিদ্ধ করতে হয় এবং চামড়ার তলার মাংসে যখন সেটি উপযুক্ত কোণ করে বিদ্ধ হয়ে থাকে, তখন ব্যাবেলটা সেই ছুঁচের মাথার 'সকেটে' পরিয়ে দেওয়া হয়।

ম্যানেজার যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে সব দেখেছেন এইভাবে হাতিটির কাছে উপস্থিত হয়, সে তখন মহানন্দে লবন দেওয়া তেঁতুল খাচ্ছে, তাই ম্যানেজারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। ম্যানেজার তাকে আদর করে কয়েকটা চাপড় মেরে তার সামনের পায়ের পিছনের নরম চামড়া খানিকটা খিমচে ধরেন। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জণীর মধ্যে ধরা সেই খিমচানো চামড়ার সবচেয়ে নরম অংশে ছুঁচ বিঁধানো হয়। মাখনের তালে গরম ছুরি যেমন স্বচ্ছন্দে চালানো যায়, তেমনি স্বচ্ছন্দেই ছুঁচ ত্বকে প্রবেশ করানো হয়। ম্যানেজারের অন্য হাতে সিবাম ভর্তি সিরিঞ্জ তুলে দেওয়া হয় এবং তিনি নির্বিঘ্নে ও খুব সহজভাবে ইন্‌জক্‌শান দিয়ে দেন। হাতি মৃদু বিবক্তি প্রকাশ ছাড়া আর কিছু করে না।

তারপর আর একটি দাঁতাল পুরুষ হাতিকে আনা হলো এবং সেও কোন ঝামেলা করল না। গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় প্রথম স্ত্রী-হাতিটির উপস্থিতি থেকে। সে বুঝতে পারল যে একটা কিছু করা হচ্ছে। তাকে গাছের সঙ্গে বাধার আগেই য়ে তার চোখ দুটি চারদিকে ঘুরতে লাগল। ম্যানেজার ছুঁচ নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হতেই সে ভাবল তাকে হত্যা করতে আসা হচ্ছে। সে ম্যানেজারের কাছ থেকে তার পাগুলি যতটা পাবে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে। মিনিট দশেক কেটে যায় আদর করে তার ভয় ভাঙাতে। অবশেষে ম্যানেজার কোনরকমে তার কাছে গিয়ে দেহে চাপড় মারে। শান্তভাবে আদর খাওয়ার বদলে সে এমন দাপাদাপি আবার শুরু করে দেয় যে বেশ খানিকট সময় কেটে যায় সহানুভূতির সঙ্গে তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার খানিকটা চামড়া খিম্‌চে ধরে ছুঁচ বেঁধাতে সক্ষম হলেন।

সে এমন আর্তনাদ শুরু করে দিল যে মনে হয় মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে। সে বসে পড়ার চেষ্টা করে ওই আধখানা ঢোকানো ছুঁচের উপর এবং সেই সঙ্গে ম্যানেজারের উপরেও। কিন্তু বসার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় সে তার গোদা পায়ের লাথি ম্যানেজারকে মারার চেষ্টা করে। রেগে গেলে লাথি মারার স্বভাব হাতিদের আছে আর হাতির লাথি খেলে মানুষের মৃত্যু হবে, একান্তই যদি মৃত্যু না হয় তবে সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে। তাই এই ধরনের কাজে হাতির খুব কাছাকাছি আসতে হলে সবসময় একটা চোখ তার পিছনের পায়ের উপর রাখতে হবে, যাতে সামনের পা দুটি বাঁধা সত্ত্বেও পিছনের পা দিয়ে সে লাথি লাগাতে না পারে।

শিগ্‌গীরই কিছু বাছা বাছা হাতির উপর এই কাজে আমায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে জানা থাকায় ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যায়। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যে মনে মনে আমি নিজেকেই সাহস দিতে থাকি।

ঘর্মাক্ত ম্যানেজার প্রাণান্ত পরিশ্রম করে শেষ পর্যন্ত সফল হলেন। ভয়ে কম্পিত কলেবর হস্তিনীকে ইন্‌জেক্‌শান শেষে সরিয়ে নেওয়া হলো।

তারপর এল মি-মুলা। সারা জীবন দুষ্টুমি করে যে আশপাশের মানুষকে জ্বালিয়ে মেরেছে, সে এখন স্থির করল যে ইনজেক্‌শান তো সে নেবেই না, এমন কি গাছের সঙ্গে তাকে বাঁধতেও দেবে না। হঠাৎ সে দৌড়ানো শুরু করে দিল, দৌড়ানোর বেগের সঙ্গে ঝটকা মেরে মাহুতকে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর বন-জঙ্গল মাঠ-ঘাট পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এক বছরের জন্যে সে নিশ্চিন্ত। এ বছরের টিকা দেওয়ার সময় পালিয়ে যাওয়ায় তার গায়ে আর ছুঁচ ফোটানোর সুযোগ কেউ পাবে না। যত হাতির সঙ্গে আমায় কাজ করতে হয়েছিল, তাদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে পাজি। আমাদের হাড় জ্বালিয়ে খেলেও তার

অসাধারণ দুষ্টুবুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। কয়েক বছর পরে আমি ও ঁকে নামে এক মাহুত তাকে কিছুটা পোষ মানাতে পেরেছিলাম।

হাতিদের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমার আত্মবিশ্বাস যখন শূন্যের ঘরে পৌঁছেছে, তখন শুনতে পেলাম ম্যানেজার আমার উদ্দেশ্যে বলছেন, 'এবারের হাতিটার উপর আপনার হাতে-খড়ি হোক। এটি একবারে নিরীহ ঠাণ্ডা প্রকৃতির—করে না কো ফোঁসফাঁস, মারে না কো ঢুঁস ঢাঁস।'

আমি মনে মনে আওড়াই,—'ভয়ের কিছু নেই। এটা মদ্দা-হাতি। মাদী হাতির চেয়ে মদ্দা হাতিরা এ কাজে নিরাপদ।'

পু-চুন-চু-এর বোধহয় ধারণা হয়েছিল আমার মতো লোক আর তাকে কতটুকু ব্যথা দিতে পারবে? পিঁপড়ের কামড় যেমন সে অবজ্ঞা করে, তেমনি অবজ্ঞাভরেই ইনজেক্‌শানের সময় সে ধীর-স্থির হয়ে রইল।

তা সত্ত্বেও আমি সবকিছু এমন সতর্কতার সঙ্গে শুরু করলাম যে তা প্রায় ভীরুতার পর্যায়েই চলে যায়। হাতিটি শুধু একবার কৌতূহলভরে শোঁকার জন্যে শুঁড় নাড়ানো ছাড়া আর কোন অঙ্গই নাড়াল না, এমন কি আমি দশ আঙুল দিয়ে [illegible] করে সামলাতে না পেরে এক সিরিঞ্জ নষ্ট করার পর দ্বিতীয় সিরিঞ্জ লাগিয়ে নিয়ম রক্ষা করলেও সে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করল না।

পরদিন আমরা বৃষ্টি-ধোয়া লাল মাটির পথ বেয়ে উপরে উঠলাম বাগানের মতো এক খোলা-মেলা জঙ্গলে, যেখানে সেগুন গাছ প্রচুর জন্মায়। তারপর আবার আরও উপরে উঠলাম। পাহাড়ের চূড়ার কাছে যতই উঠি ততই ছোট গাছের শুক্‌নো জঙ্গলে তৃণভূমির মাঝে মাঝে বাঁশঝাড় দেখতে পাই।

সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত নদীর গতিপথ ধরে আমরা

পাহাড়ের নিচের দিকে নামি। নদীটি পাঁচশো মাইল অতিক্রম করে ব্যাংককের মধ্যে দিয়ে 'শ্যাম-উপসাগরে পড়েছে। কয়েক দিন আগে বাসে করে আমরা যে পথে এসেছিলাম, এখন তার থেকে বহু মাইল পুবে আমরা আছি। এই ঘুর-পথে আমরা এলাম মি-পাম ক্রীক দেখার জন্যে। সেটি এখন আমাদের যাত্রা-পথের নিচে খুবই কাছে।

নদীর দক্ষিণ ধারে বেশ সমতলভূমি। কিন্তু বাঁ ধারে ছুদিন আমরা যে সুন্দর গিরিখাত ধরে হেঁটেছি, তাতে দেখেছি জায়গাটি বেশ চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা, লাল খাড়া পাহাড়ের সারি একটানা উঁচু বাঁধের সৃষ্টি করেছে। আমি শুনলাম ডান দিকের গাছ কাটার কাজ আগেই শেষ হয়ে গেছে এবং এখন আমাদের কাজ বাঁ দিকেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বাঁ দিকটা অত্যন্ত শুষ্ক ও প্রস্তরময় ভূমি বলে সেগুন গাছ খুব বেশি এখানে পাওয়া যাবে না,—আমার এই ধরনের মন্তব্যের জবাবে ম্যানেজারের উক্তি যে সংবাদজ্ঞাপন করল তা রীতিমত ভীতিজনক।

তিনি বললেন, 'আপনার কথা ঠিক। তবে সেগুন গাছ আছে উপরে, আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরে।'

প্রতিদিন পায়ে হেঁটে ওই রকম অঞ্চলে কাজ-পরিদর্শন করতে হবে এই কথাটা মনে মনে ভাবতেই আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ম্যানেজার কিছুকাল আগে ওইসব গহ্বরগুলি দেখে এসেছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে এক মত হলেন যে আমাদের কাঠ কাটার কাজ শেষ হবার আগেই হয়তো আমাদের পাগুলি ক্ষয়ে যাবে।

পরের দু'দিন পশ্চিম দিকে ঢেউ-খেলানো অসমতল ভূমির মধ্যে দিয়ে আমরা যখন চলি, তখন ম্যানেজার আমাকে শোনাতে থাকেন যে ওই অদ্ভুত ভু-বিবরে কী চমৎকার সেগুন গাছ, কত পশুপক্ষী আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর কথায় আমি শেষ পর্যন্ত ওইসব স্বচক্ষে দেখার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলাম।